সুশ্রুতের সূত্র স্থানের ৩৫ অধ্যায়ে উপদিষ্ট হইয়াছে। আজকাল যুদ্ধ ও পুলিশ বিভাগে লোক নির্ব্বাচন কালে দেহের উচ্চতা, ছাতির মাপ লওয়া হইয়া থাকে। কুতুহলী পাঠক চরক সুশ্রুতোক্ত প্রত্যঙ্গাদির পরিমাণের সহিত আধুনিক চিকিৎসকগণের সম্মত পরিমাণ মিলাইয়া দেখিতে পারেন। চরকের মতে মানুষের দেহের উচ্চতা নিজের আঙ্গুলের ৮৪ আঙ্গুল, সুশ্রুতের মতে ১২০ আঙ্গুল। এই ১২০ আঙ্গুল নিজের কি অন্যের তাহার উল্লেখ নাই।

রোগীর পরীক্ষা সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদ যাহা বলিয়াছেন আমরা স্থূলতঃ তাহা ব্যাখ্যা করিলাম। অতঃপর রোগ পরীক্ষার কথা লিখিত হইতেছে। সুশ্রুত বলিয়াছেন রোগ বিজ্ঞানের উপায় ছয়টী—দর্শন, স্পর্শন, শ্রবণ, স্বাদগ্রহণ, ঘ্রাণগ্রহণ ও প্রশ্ন। চিকিৎসক দর্শনেন্দ্রিয় দ্বারা যে পরীক্ষা করেন তাহাই দর্শনগত-পরীক্ষা। চিকিৎসক রোগীর মল, মূত্র, জিহ্বা, চক্ষু ও গাত্রের বর্ণ, রোগীর প্রত্যঙ্গগত অন্যান্য দর্শনযোগ্য বিকৃতি-দর্শন দ্বারা পরীক্ষা করিবেন। চিকিৎসক হস্তদ্বারা স্পর্শ করিয়া যে পরীক্ষা করেণ তাহাই স্পর্শনগত-পরীক্ষা। চিকিৎসক রোগীর ব্রণাদির পক্ক বা অপক্ক অবস্থা, প্লীহা, যকৃৎ, অগ্রমাংস প্রভৃতির বিবৃদ্ধি বা হ্রাস, শরীরের উত্তাপ বা শীতলতা ও বেদনা, শোথাদি স্পর্শদ্বারা পরীক্ষা করিবেন। শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা যে পরীক্ষা করা হয় তাহা শ্রবণ-গত পরীক্ষা। চিকিৎসক কর্ণ দ্বারা শ্রবণ করিয়া উরঃক্ষতে উরোবিচারী বায়ুর গতি-শব্দ, কাস ও স্বরভেদ রোগের কণ্ঠস্বর, অন্ত্র ও কণ্ঠের কুজন, প্রভৃতি পরীক্ষা করিবেন। রসনেন্দ্রিয় দ্বারা চিকিৎসক যে পরীক্ষা করেন তাহাই রাসন-পরীক্ষা। চিকিৎসক যে কেবল নিজের জিহ্বা দ্বারাই এই পরীক্ষা নির্ব্বাহ করিবেন আচার্য্যগণের এরূপ অভিপ্রায় ছিলনা, এতদর্থে প্রাণি বিশেষের জিহ্বা দ্বারাও যে পরীক্ষা সিদ্ধ হইতে পারে তাহার উদাহরণ আমরা শাস্ত্রের বিভিন্ন স্থানে বিবৃত আছে দেখিতে পাই। রক্তপিত্ত রোগে স্রুত রক্ত কেবল জীবরক্ত কি পিত্তমিশ্রিত জীবরক্ত, কি কেবল অনুরঞ্জিত পিত্তমাত্র ইহা পরীক্ষা করিবার জন্য আচার্য্যগণ উপরি লিখিত স্রুতবস্তু অন্নের সহিত মিশ্রিত করিয়া কুক্কুরকে ভক্ষণার্থ প্রদান করিবার উপদেশ দিয়াছেন। উহা যদি কেবল জীবরক্ত হয়, তাহা হইলে কুক্কুর সাদরে তাবৎ অন্ন ভোজন করিবে। যদি পিত্ত মিশ্রিত জীবরক্ত হয় তাহা হইলে কিঞ্চিৎ ভোজন করিয়াই পিত্তের তিক্ততা হেতু নিবৃত্ত হইবে এবং যদি নিরবচ্ছিন্ন পিত্ত হয় তাহা হইলে পিত্তের তিক্ততার ঘ্রাণ মাত্রেই নিবৃত্ত হইবে। এইরূপ প্রমেহ রোগীর মূত্র যদি পিপীলিকায় পান করে তাহা হইলে উহাতে শর্করা আছে বুঝিতে হইবে। এস্থলে কুক্কুর ও পিপীলিকার জিহ্বাই পরীক্ষার সাধন হইল। কেবল রাসন পরীক্ষার কথা কেন চক্ষু-কর্ণ-গত পরীক্ষা স্থলেও চিকিৎসক স্বীয় চক্ষু কর্ণের সাহায্য বা শক্তি বর্দ্ধনার্থ অন্য কোন যন্ত্রাদিও ব্যবহার করিতে পারেন। ইহা আচার্য্যগণের অনভিপ্রেত নহে। চিকিৎসক গন্ধগ্রহণ পূর্ব্বক যে পরীক্ষা করেন তাহাকে ঘ্রাণগত পরীক্ষা বলে। চিকিৎসক রোগীর গাত্র, মল, মূত্র, পূয, স্বেদ, নিঃশ্বাস, ব্রণ প্রভৃতির গন্ধ ঘ্রাণগত পরীক্ষা দ্বারা অবগত হইয়া থাকেন। প্রশ্ন করিয়া চিকিৎসক

রোগীর বসতি স্থান, জাতি, রোগোৎপত্তি স্থান, সাত্ম্য, দেশ, বল, ক্ষুধা; বায়ু, মূত্র, মলের বিসর্গ নিরোধ স্ত্রীলোকের রজঃ প্রবৃত্তি বা রোধ অবগত হইবেন।

রোগের পরীক্ষার কথা বলাহইল এক্ষণে আমরা রোগের উপদ্রব ও অসাধ্য লক্ষণের বিষয় কিঞ্চিৎ বলিতেছি। রোগারম্ভক দোষের প্রকোপ জন্য যে রোগ জন্মে তাহার নাম উপদ্রব—যেমন হিক্কা, তৃষ্ণা, অরুচি, শোথ প্রভৃতি জ্বরের উপদ্রব। চিকিৎসকগণ সতত রোগিশরীরে এইগুলি প্রত্যক্ষ করিতেছেন। উপদ্রবের পর এক্ষণে আমরা রোগের অসাধ্য লক্ষণের বিষয় সংক্ষেপে বলিব। যে রোগে যে লক্ষণ প্রকাশ পাইলে রোগ আরামের আর কোন সম্ভাবনাই থাকে না সেই লক্ষণকে সেই রোগের অসাধ্য লক্ষণ বলে। ইহার অন্য নাম অরিষ্ট। আয়ুর্ব্বেদে প্রতিরোগের অসাধ্য লক্ষণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এই সকল অসাধ্য লক্ষণের অব্যভিচারিত্ব দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইতে হয় এবং দৃঢ় প্রতীতি জন্মে যে ইহা সুদীর্ঘকালের সুপরিপক্ক অভিজ্ঞতার ফল। যাঁহারা রোগের বিচিত্র গতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান ও বিচার করিয়াছেন তাঁহারাই এসকল কথা বলিতে পারেন, অন্যের বলা কোন ক্রমেই সম্ভব নহে।

আমরা আয়ুর্ব্বেদের রোগতত্ত্ব অতি স্থূল ভাবে ব্যাখ্যা করিলাম। যাঁহারা আয়ুর্ব্বেদকে Empirical বলেন তাঁহারা যদি শ্রমস্বীকার পূর্ব্বক এই কথাগুলি নিরপেক্ষভাবে পাঠ করেন তাহা হইলে আশাকরি তাঁহাদের মত পরিবর্ত্তন হইবে। কোনও চিকিৎসা শাস্ত্রে রোগ ও রোগী সম্বন্ধে এতদতিরিক্ত কিছু আছে কি? এখানে যাহা স্থূলভাবে আছে অন্যত্র হয়ত তাহাই বিশদীকৃত হইয়াছে মাত্র। পক্ষান্তরে এখানে এমন অনেক তত্ত্ব আছে যাহা পাঠ করিলে অন্যান্য সম্প্রদায়ের চিকিৎসকের জ্ঞান চক্ষু উন্মীলিত হইবে। এমন অনেক বিষয় আছে যাহা বর্ত্তমান চিকিৎসক-সম্প্রদায়ের সম্পূর্ণ অচিন্তিত। যে বায়ু পিত্তকফ আয়ুর্ব্বেদে রূপ বিরাট মন্দিরের ভিত্তি স্বরূপ এস্থলে আমরা সেই বায়ু পিত্ত কফের বিষয় কিছুই বলিলাম না কেন? কেহ যদি আমাদিগকে এই প্রশ্ন করেন তাহা হইলে আমরা তদুত্তরে এই মাত্র বলিতে পারি যে পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাধকগণ যেরূপ অক্লান্ত শ্রম সহকারে রোগতত্ত্ব অনুসন্ধান করিতেছেন আর কিছুকাল এইরূপ গবেষণা-বৃত্তি জাগ্রত থাকিলে তাঁহারা স্বয়ংই বায়ুপিত্ত কফের তত্ত্ব জগতে প্রচার করিবেন। আমাদিগকে আর বুঝাইবার ক্লেশ স্বীকার করিতে হইবে না। যতদিন না সেই শুভদিন আসিতেছে ততদিন কেবল আমাদের এই সবিনয় অনুরোধ যে বায়ু পিত্তকফ-তত্ত্বকে অগ্রাহ্য করিবেন না, ধীরভাবে যথার্থ বৈজ্ঞানিকের স্বভাব-সুলভ তত্ত্বান্বেষণ-স্পৃহা হৃদয়ে লইয়া বুঝিবার চেষ্টা করুন। প্রকৃতি একদিন অবশ্যই তাঁহার রহস্য মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন করিবেন।

(ক্রমশঃ)

শিশু চিকিৎসা।

(বালিকা ও মহিলাগণের জন্য ছড়ায় লিখিত)

শ্লেষ্মা প্রধান বাল্যকালে,
পিত্ত বাড়ে যৌবন হ'লে ;
বার্দ্ধক্যে বায়ু প্রবল হয়,
সকলশাস্ত্রে ইহা কয়।
(অতএব)—শ্লেষ্মা প্রধান রেখে মনে,
যত্নে রাখ শিশুগণে।
ঠাণ্ডা যা'তে নাহি লাগে,
দৃষ্টি রেখ তা'তে আগে।
গা' সদা তা'র ঢেকে রাখ ;
প্রসূতিগণ নিয়মে থাক।
প্রসূতিগণের স্বেচ্ছাচারে,
কোমল মতির শ্লেষ্মা বাড়ে ;
সেই শ্লেষ্মা হ'লে প্রবল
শিশুশরীরে রোগ সকল।
শ্লেষ্মা কভু ভাল নয়,
হঠাৎ এতে মৃত্যু হয়।

বালক হয় তিনপ্রকার,
'দুগ্ধভোজী' যা'র দুগ্ধ আহার।
অন্ন যা'রা ভোজন করে,
'অন্নভোজী নাম তা'রা ধরে।
দুগ্ধ অন্ন ভোজী হ'লে,
'দুগ্ধান্ন ভোজী' নাম তা'রে বলে।
দুগ্ধ পায়ীর হ'লে পীড়া,
প্রসূতিকে দাও বড়ী গুঁড়া।
দুগ্ধান্ন ভোজীর পীড়া যখন,
ঔষধ দাও উভয়কে তখন।
পীড়া যদিঅন্ন ভোজীর
শিশুকে ঔষধ খাওয়াও ধীর।

দুগ্ধ পায়ীর পীড়া দেখে
উপবাসী রাখ প্রসূতিকে।
শিশুর উপবাস উচিত নয়,
স্তন্যদুগ্ধ ব্যবস্থা হয়।

বড় ঔষধ দিওনা শিশুকে কখন,
মহাজনের এটি বচন।
পাচন টোট্‌কায় রোগ সারাও,
যদি সুস্থ রাখ্‌তে চাও।

আমলকী আর হতকীর গুঁড়
ঘি মধুতে মিশাল কর।
জন্মেই যে শিশু টানে না মাই,
তার জিবে এ লাগাও সদাই।

স্তন দুগ্ধের অভাব যখন,
ছাগ দুগ্ধ কর ব্যবস্থা তখন।

গব্য দুগ্ধে শালপানি নিয়ে,
সিদ্ধ কর চিনি দিয়ে,
ছাগদুগ্ধ যদি না পাও,
এযোগ তখন খাওয়া'য়ে দাও।

ছাগ দুগ্ধের স্তায় গুণ ইহার,
ব্যবস্থা ইহা মুনি জনার।

—

এক খণ্ড মাটি আগুনে পোড়াও,
দুধে ভিজিয়ে 'নাই'তে দাও,
'নাই' এর শোথের যত কষ্ট,
বালকগণের হয় নষ্ট।

—

হলুদ, লোধ, যষ্টিমধু,
আর প্রিয়ঙ্গু নাওগে শুধু,
তৈল দিয়ে পাক ক'রে
ঘসে দাও গে 'নাই' উপরে।
(কিম্বা)—ঐ জিনিস কটি'র গুঁড় নিয়ে,
বেশ করে দাও 'নাই'তে দিয়ে,
'নাই' পাক দেওয়া ভাল্ হয়,
বিজ্ঞ বৈদ্য এ যোগ কয়।

—

বচ, হরিদ্রা, শুঁঠ, পিপুল,
মরিচ, হত্তুকী—নাও গে তুল।
শুদ্ধ দুগ্ধে এদের কল্ক দিয়ে,
সেবনে শ্লেষ্মা যায় উঠিয়ে।
শিশুর শরীর হয় দৃঢ়,
জেনে রেখ এ যোগ গূঢ়।

—

'এঁড়ে' লেগেছে যদি যায় জানা,
ছাতিম ফুল, মরিচ, গোরোচনা
পিষে নিয়ে সেবন করাও,
যদি উপকার পেতে চাও।
সিদ্ধ অন্ন বেটে নিয়ে
কলার পাতে দাও রাখিয়ে;
কুশের দ্বারা উহা বেঁধে
আগুনে রেখে নাও দগ্‌ধে;
সেবন করাও এই যোগ
সেরে যা'বে এঁড়ে লাগা রোগ।

—

তুলসীর রস মধু দিয়ে
সর্দ্দি-কাসিতে দাও খাওয়াইয়ে,
বেশী সর্দ্দি মনে কর,
মিসিয়ে নিও কর্পূরের গুঁড়।

—

ময়ূরপুচ্ছ ভস্ম মধু সহ
সর্দ্দি ব'স্‌লে খেতে দেহ।

—

আদার রস আর পুরাণ ঘিয়ে
কিম্বা পুরাণ ঘি শুধু নিয়ে
বুকে গলায় মালিশ কর
সর্দ্দি যদি বসে বড়।
দু' আনা পিপুল আর তুলসী মঞ্জরী,
যষ্টীমধু, মিছরি, কণ্টকারি,
বড় এলাচ আর হরিতকী
ওজন কর একটি সিকি রাখি,
সিদ্ধ কর দেড় পোয়া জলে,
নামিয়ে নাও এক ঝিনুক্‌ রইলে,
খাওয়াইয়ে দাও দু'তিন বারে
সর্দ্দি কাশি শিগ্‌গির সারে।
জিনিসগুলি পূর্ব্ব রাতে
ভিজিয়ে রেখ পাথর পাতে।

—

মরিচ, পিপুল, শুঁঠের গুঁড়
বচ, হত্তুকী মিশাল কর;
আর হরিদ্রা সমান নাও,
দুধের সঙ্গে খেতে দাও,
শ্লেষ্মা এতে হয় সরল
শরীর এতে হয় সবল।
বয়স একমাস হ'য়েছে যা'র
মাত্র এক কুঁচ ব্যবস্থা তা'র।

বয়স বাড়ার পরিমাণে,
ব্যবস্থা ক'র মাত্রা জ্ঞানে।

সরষের তেল বুকে মালিস কর,
শ্লেষ্মা বস্‌লে ফল বড় *।

নাগর মুতা, হত্তুকী, নতি,
যষ্টিমধু, নিমছাল—সাড়ে আটত্রিশ রতি,
আধ্‌সের তুলে রেখে আধ্‌পোয়া
এক ঝিনুক খাওয়াও চুমুক দিয়া,
বাকীটুকু দাও গে' ফেলে,
শিশুর জ্বর যা'বে চ'লে।
"মুস্তাদি" নাম এর হয়,
ক্বাথ যেন একটু নরম রয়।

নতি, নিমছাল, হরীতকী,
বয়ড়া, হলুদ, আমলকী,
বত্রিশ কুঁচ এক একটি নিয়ে
আধ্‌সের জলে দাও চাপাইয়ে।
এক ঝিনুক মাত্র—আধ পোয়া র'লে
খাইয়ে দাও জ্বর যা'বে চ'লে।
"পটোলাদি" নাম হয় ইহার;
বিস্ফোট রোগেও হয় প্রতীকার।

হলুদ, দারু-হরিদ্রা, যষ্টীমধু
চাকুলে, ইন্দ্র-যব নাও সে শুধু,
আটত্রিশ কুঁচে কর ওজন
আধসের জল রাখ আধ্‌পো যখন,
সবটুকু ফেলে একটু খানি।
খাওয়ায়ে দাও জ্বর অতিসার জানি॥
অতি কচি শিশু হ'লে
শিশুর মা'কে খেতে শাস্ত্রে বলে।
"হরিদ্রাদি" ইহার নাম করণ,
ক'রে গেছেন মুনি জন।

শুঁঠ, আতইচ, কুড়চির ফল,
আটত্রিশ রতি নাও সকল।
মুতা, বালা তা'তে দিয়ে
আধ্‌সের জলে আধপোয়া নিয়ে,
শিশুর অতিসারে খেতে দাও,
দেখ্‌বে কেমন ফল পাও।
"নাগরাদি" নাম হয় এর
এর গুণ জেন ঢের।

বরাহক্রান্তা, ধাইফুল,
লোধ আল নাও অনন্তালে,
এক একটি ওজন আধ আধ ভরি,
আধ্‌সের জলে সিদ্ধ করি।
আধ্‌পোয়া থাকতে নামিয়ে নাও
মধু সহ খানিক খাওয়াও,
শিশুর অতীসার যা'বে সেরে,
"সমঙ্গাদি" নাম বলে এরে।

বেলশুঁঠ, বালা, লোধ, ধাইফুল,
আর নাওগে গজপিপুল,
আটত্রিশ রতি কর ওজন
আধ্‌সের জল, রাখ আধপোয়া যখন।
খেতে দাও এই ক্বাথ অতীসারে
কিম্বা—ঐ সকলে গুঁড় ক'রে

---

* কেহ কেহ সরষের তৈল উহার সমপরিমাণ ভূর্জ্জপত্রের তৈল ও ৫.৬ ফোঁটা তার্পিণ তৈল একত্র মিশাইয়া মালিশ করিতে বলেন। ইহাতে আরও শীঘ্র উপকার দর্শে, কারণ কয়েকটি ঔষধের মিলিত শক্তির পরস্পর সাহায্য দ্বারা রোগ প্রতীকারের পক্ষে স্বতঃ সুফল প্রসব করিয়া থাকে। ভূর্জ্জপত্রের তৈল "ক্যাজুপটী অয়েল" নামে বেনের দোকানে চাহিলে পাওয়া যায়।

মধুর সহ করাও লেহন ;
"বিল্বাদি" এর নাম করণ।

আমের আঁটির মজ্জা আধ্ ভরি
আধ্ ভরি বেলশুঁঠ ওজন করি।
আধ্ সের জলের আধ্ পোয়া রাখ,
ভাল ক'রে তা'র পর ছাঁক।
'খই' আর চিনি মিশাও তা'তে,
বমন অতিসারে দাওগে খেতে।
"বিল্বত্য" নাম ইহার,
এ যোগ জেন মুনি জনার।

সরল কাষ্ঠ, দেবদারু, কণ্টকারি
বৃহতী, গজপিপুল নাও মিশাল করি।
হলুদ, শুল্‌কা নাও চাকুলে,
বেশ্ ক'রে নাও পিষে শিলে,
খেতে দাও ঘি মধু দিয়ে,
জ্বর অতীসার যায় সারিয়ে।
বাত, কামলা, পাণ্ডুরোগ,
গ্রহণী সারে—এমনি যোগ।

আতইচ এর গুঁড় মধু সহ
জ্বর কাশি বমিতে খেতে দেহ।
কিম্বা—ইহার সঙ্গে মুতার গুঁড়
আর কাঁকড়া শৃঙ্গী মিশাল কর।
"শৃঙ্গাদি" নাম ইহার হয়
বাল রোগ যায় সমুদয়।

তিল, যষ্টীমধু পিষে নিয়ে
তেল, মধু আর চিনি দিয়ে,
রক্তামাশয় হ'লে ছেলের
লেহন করাও—ফল ঢের।

খই, যষ্টীমধু, চিনি মধু
চেলুনি জলে মিশাও শুধু,
আমাশয়ে খেতে ব্যবস্থা কর,
শিশুরোগে উপকার বড়।

কাঁকড়াশৃঙ্গী, মুতা, পিঁপুল,
আর আতইচ সমান তুল।
গুঁড় করে মধু সহ,
অতীসার বমিতে খেতে দেহ।
শ্বাস কাসের যত কষ্ট,
এ যোগেতে হয় নষ্ট।
"বালচাতুর্ভদ্রিকা" নাম ইহার
গুণ জানা আছে বিজ্ঞজনার।

বেলশুঁঠ, বালা, লোধ, ধনে
ধাইফুল, ইন্দ্রযব—সব ওজনে,
গুঁড় ক'রে মধুর সহ
জ্বরাতিসারে খেতে দেহ।
"ধাতক্যাদি" এরে কয়
বমি উপদ্রবও ভাল হয়।

মৌরি, পিঁপুল, রসাঞ্জন
কাঁকড়াশৃঙ্গী, মরিচ, খই চূরণ
সমান ভাগে মধুর সহ
জ্বর কাশি বমিতে খেতে দেহ।

কণ্টকারি ফলের রস বৃহতী নিয়ে
মধু আর মিশাও ঘিয়ে।
স্তন-দুগ্ধ পানে হয় বমন
সেবন করাও হ'বে নিবারণ।

আম আঁটির শাঁস, সৈন্ধব, খই
খাওয়া'লে বমি থাকে কই।

মধু একটু মিশিয়ে নিও
যখন তখন এর ব্যবস্থা দিও।

পিপুল মরিচ, চিনি, মধু
ছোলঙ্গ লেবুর রসে মাড় শুধু।
হিক্কা বমিতে দাও এ যোগ—
আর থাকবে না কোন রোগ।

ঝাপী টুপরী, আকলাদি মূল,
জাম, আমের ছাল সমতুল,
ধুদর, নাই, তালুতে বেটে
বমি অতীসারে দাও—যা'বে কেটে।

কদ্‌বেল কাকমাচী, কুল, আমরুল,
সমান ভাগে কর তুল।
বেটে মাথায় লেপন কর,
বমি, অতীসারে—ফল বড়।

মাসকলাইয়ের যূষ, পিপুল চূর
মারে খেলে ছেলের আম দূর।

আম, আমড়া জামের ছাল
অতীসারে দেয় ফল।
মধু একটু মিশিয়ে নিও,
জিনিষ ক'টির গুঁড় দিও।

জীরে, সাদা ধুনার গুঁড়
আমাতিসারে ফল বড়।

বেল-মূলের কাথ, খই, চিনি
বমি, অতীসার যায় গো জানি।

ছাগ দুগ্ধ আর জাম ছালের রস,
শিশুর অতীসার হয় বশ।

মলদ্বার যদি পাকে ছেলের,
খাওয়াও গুঁড়া রসাঞ্জনের।

পিপুল, মরিচ, ছোট এলাচ চূরণ
চিনি, মধু আর সৈন্ধব লবণ,
ক'রে নিয়ে এই অবলেহ
শিশুর মূত্ররোগে খেতে দেহ।

শ্রীসত্যচরণ সেনগুপ্ত।

আমলকী।

আমলকী সুপরিচিত ফল। যখন আমলকী আমাদের গৃহে গৃহে খাদ্য ও ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইত, তখন আমরা আমলকী বৃক্ষকে যত্নে পালন করিতাম। প্রতিপালিত হওয়ায় আমলকী বৃক্ষ পুষ্ট বীর্য্যবান্ বৃহত্তর ফল প্রদান করিত। এখন আদর না থাকায় বনদেবী তাহাকে ক্রোড়ে লইয়াছেন। আর আমরা গ্রামোপান্তে অযত্নসম্ভূত আমলকী বৃক্ষের হীন-বীর্য্য ক্ষীণ ফল কুড়াইয়া লইয়া তাহার নিকট হইতে শাস্ত্রোক্ত গুণাবলীর দাবি করিয়া আয়ুর্ব্বেদকে উপহাস করিতেছি। বাঙ্গালা দেশের আমলকীকে ম্যালেরিয়া ধরিলেও এখনও দেশান্তরে সুপুষ্ট বীর্য্যবান্ আমলকী প্রকৃতিদেবীর কল্যাণে আমাদের পক্ষে দুষ্প্রাপ্য নহে। আমরা, দেশের চিরোপকারী আমলকী বৃক্ষের প্রতি সদয় দৃষ্টি প্রার্থনা করিয়া এবং

পাঠক পাঠিকাগণের নিকট আমলকীর উপকারিতা প্রচার কামনায় হরীতকীর পর (অগ্রহায়ণ সংখ্যার ১৩০পৃঃ) আজ আমলকীর প্রস্তাব লইয়া উপস্থিত হইলাম।

আমলকী খাদ্যরূপেও যথেষ্ট ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অনেকেই আমলকীর মোরব্বা, আমলকীর চাটনী ও আচারের আস্বাদ গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। ঔষধের জন্য কাঁচা ও শুষ্ক দুই প্রকার আমলকীই ব্যবহৃত হয়। কাঁচা আমলকী শরৎ ও হেমন্ত ঋতুতে প্রচুর পাওয়া যায়। শুষ্ক আমলকী বেণের দোকানে পাওয়া যায়। চরকের "রসায়ন" পাদ আমলকীর যশোগানে পূর্ণ। "চ্যবনপ্রাশের" নাম অনেকেই শুনিয়াছেন। এই চ্যবনপ্রাশের প্রধান উপাদান আমলকী। চরকে কথিত হইয়াছে—একদা ঋষিগণ লোকহিতার্থে গ্রাম্যবাস স্বীকার করিয়াছিলেন। গ্রাম্যবাসে তাঁহাদের বুদ্ধি মলিন, শরীর অলস ও কান্তি ম্লান হওয়ায় তাঁহারা "আমলক রসায়ন" সেবন করিয়া তপশ্চর্য্যার শক্তি ও অমরত্ব লাভ করিয়াছিলেন। আমলকী, আর কি তুমি সেই পুরাকালের মত ব্রহ্মামৃত পূত হইয়া এই অকাল জরামৃত্যুগ্রস্ত ভারতে দেখা দিবে না?

আমলকী—কষায়, কটু, তিক্ত, মধুর ও অম্লরসবিশিষ্ট, রুক্ষ এবং শীতবীর্য্য, ইহা অম্লরসযুক্ত বলিয়া প্রকুপিত বায়ুর প্রশমক, মধুর রসযুক্ত ও শীতবীর্য্য বলিয়া পিত্তের এবং কষায় রস বিশিষ্ট ও রুক্ষবীর্য্য বলিয়া কুপিত কফের শান্তিকারক, সুতরাং ইহা মানবজীবনকে উক্ত ত্রিবিধ মহান্ অন্তরায় হইতে রক্ষা করিয়া সমভাবে পরিচালিত করে, ঔষধার্থ ইহার ফল ও বীজ এবং স্থলবিশেষে পত্রও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ঔষধ প্রয়োগে ইহার মাত্রা স্বরস (জলভিন্ন রস) ২ তোলা, চূর্ণের পরিমাণ পূর্ণ বয়স্কের পক্ষে চারি আনা হইতে অর্দ্ধ তোলা পর্য্যন্ত। আয়ুর্ব্বেদোক্ত ত্রিফলার অন্তর্গত থাকিয়া এই মহৌষধ গৌণভাবে বহুরোগে উপকারী হইলেও কয়েকটী রোগে মুখ্যতঃ ইহার উপকারিতা নিম্নে নির্দ্দেশ করা যাইতেছে।

জ্বরে—আমলকী গুলঞ্চ ও ধ'নের সহিত সমানভাগে সিদ্ধ করিয়া সেবন করিলে বাতিক জ্বর নষ্ট হয়, পিপাসাযুক্ত পিত্তজ্বরে পাচনের মত ২ তোলা অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করতঃ অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সেবনে আশু উপকার হয়। দাহযুক্ত প্রবল জ্বরে, মস্তকে রক্ত সঞ্চরণ (congestion) হইয়া চক্ষু রক্তবর্ণ ও মস্তকে দাহ উপস্থিত হইলে আজকাল বরফ জল কিম্বা ঠাণ্ডা জলের অবধি পটী ও "আইস্ ব্যাগই" তাহার একমাত্র শান্তিকারক হইয়া দাঁড়াইয়াছে, কিন্তু ঐরূপ অতিরিক্ত শৈত্য ক্রিয়া অনেক স্থলে নিউমোনিয়া প্রভৃতি উৎকট শ্লেষ্মজ ব্যাধির কারণ হইয়া থাকে, ঐরূপ ক্ষেত্রে আমলকী ঘৃতে ভাজিয়া কাঁজি কিম্বা তদভাবে আমলকীর রস দিয়া পেষণ করিয়া তালুতে রগে ও কপালে প্রলেপ দিলে বরফের ন্যায় শীতক্রিয়া সম্পাদিত হইয়া থাকে, অথচ অনিষ্টের সম্ভাবনা থাকে না, হরিতকী, পিপুল ও চিতার মূলের সহিত আমলকী সিদ্ধ করিয়া পান করিলে কফ-জ্বর নিবারিত হয়, গুলঞ্চ ও মুথার সহিত আমলকী সিদ্ধ করিয়া পান করিলে চতুর্থক (দুই দিন ছাড়া) জ্বর নিবারিত হয়, বিসর্প জ্বরে আমলকীর রস গব্য ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিলে জ্বরের শান্তি হয়, এক ভাগ আমলকী ও চারি

ভাগ মুগের ডাইল আটগুণ জলে সিদ্ধ করিয়া দুই ভাগ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইলে; সেই মুগের যুষ বাত্তিক জ্বরে, পৈত্তিক জ্বর ও বাত-পৈত্তিকজ্বরের অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ ও পথ্য হইবে।

কোষ্ঠাশ্রিত বায়ুজনিত মলবদ্ধতায় ও পেট ফাঁপায় কিঞ্চিৎ তেউড়ী চূর্ণের সহিত আমলকীর রস সেবন করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

অর্শরোগে—আমলকী উত্তমরূপে পেষণ করিয়া মৃত্তিকা নির্ম্মিত কোন পাত্রের অভ্যন্তরে লেপন করিবে, তৎপর সেই পাত্রে ঘোল রাখিয়া পান করিলে উপকার হয়, অতিসারে আমলকী আঙ্গুর ও মধুর সহিত উত্তমরূপে পেষণ পূর্ব্বক সরবত্ প্রস্তুত করিয়া পানীয়রূপে ব্যবহার করার উপকারিতা দর্শনে পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণও মুগ্ধ হইয়াছেন।

পিত্তশূলে—আমলকীর রস চিনির সহিত পান করিবে।

কাশে—আমলকীচূর্ণ দুগ্ধ সহ পাক করিয়া ঘৃতের সহিত সেবন হিতকর, (২) দুই তোলা আমলকী চূর্ণ, দেড় পোয়া জল ও আধ পোয়া দুগ্ধের সহিত সিদ্ধ করতঃ আধ পোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া উহাতে সহ্য মত আধ তোলা কিম্বা ¼ তোলা গব্য ঘৃত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে উপকার হয়।

হিক্কায়—আমলকী এবং কয়েদ বেলের রস পিপুলচূর্ণ ও মধুর সহিত সেবনে উপকার দর্শে।

বাত্তিক বমনে—আমলকীর রসে শ্বেতচন্দন ঘসিয়া গাঢ় হইলে কুল প্রমাণ তাহার বটী প্রস্তুত করিয়া মধুর সহিত সেবন অমোঘ প্রতিকারক।

রক্তপিত্তে—নাসিকা হইতে রক্ত পতন নিবারণের জন্য শুষ্ক আমলকী ঘৃতে ভাজিয়া কাঁজিতে পেষণ পূর্ব্বক মস্তকে প্রলেপ দিবে।

বাতরক্তে—আমলকীর রসের সহিত পুরাতন ঘৃত পান করিবে। (২) খদির কাষ্ঠ (খয়ের কাঠ, বেনে দোকানে পাওয়া যায়) ১ তোলা ও শুষ্ক আমলকী ১ তোলা, আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া পান করিবে।

প্রমেহে—হবিষ্যার ভোজন পূর্ব্বক আমলকী অধিক মাত্রায় ভোজন করিবে, (২) প্রস্রাবের যন্ত্রণায় অধিক পরিমাণ আমলকীর রস সেবনে আশু উপকারক (৩) ইক্ষুরসের সহিত আমলকীর রস সমভাগে সামান্য মধুর সহিত পান করিবে। ইহাতে অতিশয় যন্ত্রণাদায়ক সরক্ত মূত্র নির্গমন ও মূত্ররোধ নিবারিত হয়। প্রস্রাব অল্প অল্প হইলে কিম্বা বন্ধ হইলে আমলকী বাটা তলপেটে প্রলেপ দিলে প্রস্রাব হয়। (৪) মধুর সহিত আমলকীর রস সেবন প্রমেহে উপকারী।

মূত্ররোধে—আমলকী জলে পেষণ পূর্ব্বক নাভির নিম্নদেশে প্রলেপ দিবে। পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণও ইহার উপকারিতা স্বীকার করেন।

শোথে—আমলকীর রস তেউড়ী চূর্ণের সহিত পান করিবে।

শীতপিত্ত রোগে—(চর্ম্মের উপর বোল্‌তা দংশনে যেরূপ চাকা চাকা ফোলা হয়, সেরূপ হইলে) আমলকী চূর্ণ পুরাতন ইক্ষুগুড়ের সহিত সেবন করিবে। পুরাতন গুড়ের অভাব হইলে নূতন ইক্ষুগুড় ১০।১২ ঘণ্টা রৌদ্রে শুকাইয়া লইবে। ইহা বীর্য্যবর্দ্ধক এবং চক্ষুরোগের উপকারক, রক্তপিত্ত দাহশূল ও মূত্রকৃচ্ছ্র রোগেও উপকার করিয়া থাকে।

শ্বেত প্রদরে—আমলকীর চূর্ণ কিম্বা রস মধুর সহিত সেবন করিবে। (২) আমলকীর বীজ উত্তমরূপে পেষণ পূর্ব্বক চিনি ও মধুর সহিত সেবন করিবে।

যোনিদাহে—আমলকীর রস চিনি সহ পান করিবে।

শিরঃক্ষতে—আমলকী চিনি ও ঘৃতের সহিত পেষণ করিয়া মস্তকে লেপন করিবে, আধুনিক পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ আমলকী, কুঙ্কুম ও নীলোৎপল (নীল সুঁদি) গোলাপ জলের সহিত উত্তমরূপে পেষণ করিয়া শিরঃপীড়ায় দিতে বলেন।

চোখ উঠায়—সুপক্ক আমলকীর রস বিন্দু বিন্দু চক্ষুতে দিলে যন্ত্রণা ও লৌহিত্য নিবৃত্তি হয়।

চুল উঠায়—আমলকীর রসের সহিত তিলতৈল পাক করিয়া, শীতল হইলে কেশে মাখিবে। ইহাতে কেশ কৃষ্ণবর্ণ ও চিক্কণ হয়।

বমনে—আমলকীর রসে শ্বেতচন্দন ঘর্ষণ করিয়া গাঢ় করিবে, আমলকীর মত এক একটী বটিকা করিয়া, মধু সহ লেহন করিলে বায়ু জন্য বমন আরাম হয়।

শিশুর চর্ম্মরোগে—শিশুর "বিখাজ" "কাউর" হইলে শুষ্ক আমলকী গুঁড়া করিয়া গোমূত্রে ৭ বার "ভাবনা" দিবে, পরে উহা বড়ির মত করিয়া শুকাইয়া রাখিবে—এই ঔষধ গোমূত্রে ঘসিয়া লাগাইবে—ইহাতে কোন জ্বালা যন্ত্রণা নাই—অথচ ফলপ্রদ।

শিরঃপীড়ায়—শুষ্ক আমলকী, গোলাপের কুঁড়ি, জাফ্‌রাণ গোলাপ জলে বাটিয়া কপালে প্রলেপ দিলে বায়ু জন্য মাথা-ধরা আরাম হয়। আমলকী বৃক্ষের শাখা ঘোলাজলে ডুবাইয়া রাখিলে জল নির্ম্মল হয়।

কবিরাজ—

শ্রীসুরেন্দ্রকুমার কাব্যতীর্থ।

স্নেহন ও স্বেদন বিধি।

ঘৃত।

ঘৃত—বায়ুপিত্ত হর; রস শুক্র আর,
ওজ পদার্থের হয় হিতৈষী আবার;
অগ্নিদাহ গাত্র জ্বালা শান্তি প্রদায়ক।
কোমলত্বকর, স্বর-বর্ণ প্রসাদক॥
বাতপিত্ত রোগ, সেই প্রকৃতি যাহার,
দৃষ্টি শক্তি বৃদ্ধি করা অভিপ্রায় যার;
ক্ষত-ক্ষীণ রোগী, বৃদ্ধ, বালক, দুর্ব্বল,
সুস্বর-দীর্ঘায়ু যেই চাহে বর্ণ, বল;
পুষ্টি, সৌকুমার্য্য, ওজ যাচে যে সন্তান,
স্মৃতি, মেধা, বুদ্ধীন্দ্রিয়, অগ্নি বলবান্;
যারা দাহ, শস্ত্র, বিষ, অনলে পীড়িত।
তাহাদের পক্ষে হয় ঘৃত পান হিত॥

তৈল।

তৈল বায়ু হর; শ্লেষ্ম-বল-বিবর্দ্ধক,
ত্বকে হিত, উষ্ণশক্তি, যোনি বিশোধক;
বিশেষত শরীরের স্থৈর্য্যতা কারক॥
যাহাদের কফ আর মেদাধিক্য হয়,
গলা ও উদর স্থূল, চঞ্চলাতিশয়;
বাত ব্যাধিগ্রস্ত, বায়ু প্রকৃতি যাহার,
শরীরের বল তনু লঘু দৃঢ় আর,
স্থির গাত্র করিবারে আকাঙ্ক্ষা যাহার;
চর্ম্মে সাদ স্নিগ্ধ, তনু, মসৃণত্ব যার;
ক্রিমি, ক্রূর কোষ্ঠ, নালীক্ষতে যে পীড়িত।
তৈলাভ্যস্ত শীতকালে তৈল-পান হিত॥

বসা।

বাতাতপসহ, রুক্ষ দেহ-ধাতু যার,
কৃশ হয় তার বহি পথশ্রমে আর ;
রেতঃ, রক্ত, কফ, মেদ শুষ্ক যার হয়,
অস্থি, সন্ধি, শিরা, স্নায়ু, মর্ম্মে শূল রয় ;
যাদের ইন্দ্রিয়-স্রোতমহাবাতাবৃত,
অগ্নিবল অভ্যস্তের বসাপান হিত ॥

মজ্জা।

দীপ্তাগ্নি বিশিষ্ট, ক্লেশ সহিষ্ণু আবার,
বহুভোজী, স্নেহাভ্যস্ত, বাতব্যাধি যার ;
ক্রূর কোষ্ঠ যাহাদের ; স্নেহ যোগ্য যদি।
তাহাদের পক্ষে হয় মজ্জা পান বিধি ॥

স্বেদন বিধি।

তাপ, উষ্ণ, উপনাহ, দ্রব চতুষ্টয় !
স্বেদের প্রকার ভেদ, বায়ুনাশী হয় ॥
বিশেষত তাপ উষ্ণ স্বেদে কফ নাশ।
উপনাহে বায়ু, দ্রবে পিত্তের বিনাশ ॥
বলবান, উৎকট ব্যাধি প্রপীড়িত ;
শীতকালে মহাস্বেদ হইবে বিহিত ॥
দুর্ব্বল ব্যক্তির পক্ষে স্বল্প স্বেদ দিবে।
মধ্যমাবস্থায় মধ্য স্বেদ আচরিবে ॥
কফ কোপে রুক্ষ স্বেদ, বাত শ্লেষ্ম রোগে
রুক্ষ স্নিগ্ধ দুইরূপ স্বেদই প্রয়োগে ॥
কফ-মেদ কৃত বাত অবরুদ্ধ হ'লে,
উষ্ণগৃহ, রৌদ্রসেবা, যুদ্ধোদ্যম বলে ;
পথ পর্য্যটন, গুরু আবরণ গায়,
চিন্তা ও ব্যায়াম তার বহিবেক তায়,
নস্য, বস্তি, শোধনাদি হ'লে প্রয়োজন,
অগ্রে স্বেদ বিধি তাহা রাখিবে স্মরণ।
ভগন্দর, অশ্মরী ও অর্শরোগ ত্রয়ে,
শস্ত্রকর্ম্ম পরে স্বেদ প্রয়োগ অন্তরে ॥
মূঢ় গর্ভ শল্যোদ্ধারে, কালে বা অকালে,
প্রসবান্তে স্বেদ বিধি সকলেই পালে।
ভুক্ত পরিপাক অন্তে, বায়ুশূন্য স্থান।
সর্ব্ববিধ স্বেদ বিধি জানিবে সন্ধান ॥
স্নেহ সিক্ত জলে স্বেদ প্রদান করিলে,
ধাতুগত দোষ তার দ্রবীভূত হ'লে,
কোষ্ঠ অভ্যন্তরে তাহা করিয়া প্রবেশ,
বিবেচিত হ'য়ে থাকে জানিবে বিশেষ ॥
শরীরেতে স্নেহ মাখি, আর্দ্রবস্ত্র দিয়া,
আবরিয়া চক্ষুদ্বয়, স্বেদ প্রদানিয়া,
রোগীর হৃদয়ে পরে শীতল স্পর্শন।
করাইবে, ইহা যেন নহে বিস্মরণ ॥
অজীর্ণ, দুর্ব্বল, মেহ, ক্ষতক্ষীণ রোগে ;
গর্ভিণী, তৃষ্ণার্ত্ত জনে স্বেদ না প্রয়োগে।
অতিসার, রক্তপিত্ত, পাণ্ডু ও উদর,
মেদ রোগে স্বেদ নাহি হয় হিতকর।
ইহাদের স্বেদে রোগ অসাধ্য হইবে।
নতুবা শরীর ক্রমে বিনাশ পাইবে ॥
যদিও একান্ত স্বেদ্য হয় বিবেচিত।
মৃদু স্বেদ দান তারে করিবে নিশ্চিত ॥
হৃদয়, নয়ন, মুষ্কে, স্বেদ দিতে হ'লে।
মৃদু স্বেদ বিধি তার জানিবে সকলে ॥
অতিরিক্ত স্বেদ দিলে সন্ধি পীড়া হয়।
দাহ, তৃষ্ণা, ক্লান্তি, ভ্রান্তি, রক্তপিত্তাময়,
পীড়কাদি উপদ্রব হ'লে উপস্থিত।
করিবেক শীতল ক্রিয়া তাহাতে নিশ্চিত ॥

তাপস্বেদ।

অলক্তক দ্বারা দেহ করিয়া বেষ্টন,
অম্লসিক্ত বালু, বস্ত্র, হস্তে বা কখন।
উষ্ণ করি সেই স্বেদ করিবে প্রদান।
তাপ-স্বেদ নামে তাহা হয় অভিধান ॥

উষ্ণস্বেদ।

বাতনাশী দ্রব-ক্বাথ-রসাদি পূরিয়া,
উষ্ণঘটে একপার্শ্বে ছিদ্রেক রাখিয়া,

ধাতু কিম্বা কাষ্ঠনল হাতেতে পুরিবে।
ষড়ঙ্গুলী মুখ, দীর্ঘ দ্বিহস্ত করিবে॥
ক্রমশ গোপুচ্ছাকৃতি সূক্ষ্ম অগ্রভাগ,
স্বেদ সৌকার্য্যার্থে নল হবে তিন ভাগ।
বাত রোগাক্রান্ত জনে তৈলাদি মর্দ্দিয়া,
আসনে বসাবে গুরু বস্ত্রে আবরিয়া।
হস্তিশুণ্ডিকাখ্য নল করিয়া ধারণ।
স্বেদ প্রদানিবে পরে হ'য়ে একমন॥
দেহ পরিমাণ ভূমি করিয়া মার্জ্জন।
তৎপরে খদির কাষ্ঠ করিয়া দাহন॥
দুগ্ধ কাঁজি দ্বারা তাহা করি অভ্যুক্ষণ,
করিবে বাতঘ্ন পত্রে ভূমি আচ্ছাদন।
করাইয়া তদুপরি রোগীকে শয়ন।
মাষাদি দ্বারায় স্বেদ করিবে তখন॥

উপনাহ স্বেদ।

কাঁজি দ্বারা বাত হর ঔষধ পিষিয়া,
লুন, স্নেহ, দুগ্ধ, মাংসরস মিশাইয়া;
বাত-রোগী অঙ্গে উষ্ণ করিয়া লেপন,
উপনাহ স্বেদ তায় করিবে তখন।
অথবা আনূপ-গ্রাম্য মাংসরস আর,
জীবনীয়গণ, দধি, সৌবীর আবার,
দুগ্ধ, বীরতরু আদিগণ সম্মিলনে,
পূর্ব্বোক্ত বিধানে স্বেদ দেয় কোনজনে॥
গোধুম, সর্ষপ, তিল, কুলথকলায়,
দেবদারু, সেফালিকা, তিসি, মাষকলায়,
শলুফা, স্থূলজীরক, ভেরেণ্ডার মূল,
জীরা, রাস্না, মৌরী, মূলা, শজিনা, পিপুল
বাবুইতুলসী, কাঁজি, গাঁন্ধাল, সৈন্ধব,
অশ্বগন্ধা, দশমূল, বেড়েলা এসব,
গুড়ূচী, বানরীবীজ, যত পাওয়া যায়।
কুট্টিত করিয়া সিদ্ধ করিয়া তাহায়;

অতঃপর বস্ত্রখণ্ডে বান্ধিয়া লইবে।
ঈষদুষ্ণ অবস্থায় স্বেদ প্রদানিবে॥
এ মহাশাবন স্বেদ নামে অভিহিত।
সর্ব্ববিধ বাত এতে হয় অন্তর্হিত॥
কাঁজিতে পেষণ করি উষ্ণ অবস্থায়,
কিম্বা সিদ্ধ, বস্ত্রে বান্ধি স্বেদ দিবে তায়॥

দ্রব স্বেদ।

বাতহর দ্রব্য-ক্বাথে, কটাহ বা দ্রোণী
পূর্ণকরি বসাইবে তাতে রোগী আনি।
আকণ্ঠ মগন করি রাখিবে তাহায়।
দ্রব স্বেদ কহে তাহে কহিনু তোমায়॥
দ্রোণটী সুবর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, লৌহ, কিবা,
কাষ্ঠ দ্বারা চতুষ্কোণ প্রস্তুত করিয়া।
ছাব্বিশ অঙ্গুলী দীর্ঘ, প্রস্থ, উর্দ্ধে হবে।
অথচ মসৃণ তাহা অবশ্যই রবে॥

পক্ষান্তরে।

নাভি উর্দ্ধে ষড়ঙ্গুলী নিমগ্ন করিয়া,
বসাইবে, উষ্ণ ক্বাথ ধারায় ঢালিয়া,
স্কন্ধদেশে যতক্ষণ দ্রোণী পূর্ণ নয়,
ততক্ষণ ধারাপাত করিবে নিশ্চয়।
অবগাহনের বিধি মুহূর্ত্ত চতুষ্টয়,
অথবা আরোগ্য চিহ্ন যবে দৃষ্ট হয়।
তৈল, দুগ্ধ কিম্বা ঘৃতে স্বেদ প্রদানিবে।
দুই একদিন পরে স্নেহ আচরিবে॥
লোমকূপ, শিরামুখ, ধমনী দ্বারায়,
স্নেহ পশি দেহ মধ্যে বল, তৃপ্তি পায়!
জল সিক্তে বীজাঙ্কুর বর্দ্ধিত যেমন।
স্নেহ সিক্তে ধাতু বৃদ্ধি হইবে তেমন॥
দ্রব স্বেদ তুল্য হেন বাত বিনাশক।
উপায় কিছুই নাই জানিবে ভিষক্॥
শীত, শূল, স্তব্ধ, দেহ গুরুত্ব হরিলে,
স্বেদ সম্বরিবে মৃদু অগ্নি উত্তেজিলে॥

অরিষ্ট প্রকরণ।

অরিষ্ট কাহাকে বলে, যে সকল লক্ষণ দেখিয়া মনুষ্যের ভাবী মরণ নিশ্চয় করা যায়, তাহাদিগকে অরিষ্ট লক্ষণ বলে। কি সুস্থ শরীরে, কি রুগ্নাবস্থায় সকল সময়েই মৃত্যুর পূর্ব্বে এই সকল লক্ষণ দেখা দিয়া থাকে। এমন কি, মৃত্যুর এক বৎসর পূর্ব্বেও এই সকল লক্ষণের আবির্ভাব হইয়া থাকে। রুগ্নাবস্থায় এই সকল অরিষ্টদ্বারা রোগের অসাধ্যত্ব বোধ হইয়া থাকে। এই সকল অরিষ্ট লক্ষণ শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, মানসিক বৃত্তিনিচয়ে, চক্ষুকর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ে, হস্তপদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়ে, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধে, স্বপ্নযোগে, শরীরের মর্ম্মস্থানে নিমিত্তসকলের প্রাদুর্ভাবে দৃষ্ট হইয়া থাকে। শরীরের কোন স্থানে কিরূপ ব্রণ, ব্যঙ্গ, তিলকালক বা পীড়কাদির আবির্ভাব হইলে সুস্থশরীরীর মৃত্যু অনিবার্য্য, কিরূপ স্বপ্ন দেখিলে স্বপ্নদর্শনকারীর আয়ুকাল নিঃশেষিত হয়, অথবা গুল্ম বা উৎকট রক্তপিত্ত রোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে গুল্মরোগী কিরূপ স্বপ্ন দেখে; চক্ষুকর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ও হস্তপদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের কিরূপ বিকৃতিতে আয়ুর্ব্বিঘাতক চিহ্ন উপস্থিত হয়, জ্বরাদি রোগে মস্তকের সীমন্তে, দন্তে বা নাসিকাদি প্রদেশে কি কি লক্ষণ উপস্থিত হইলে জ্বরাদিরোগ অসাধ্য হইয়া ভাবী মরণের সূচনা করিয়া থাকে, আসন্ন মৃত্যুকালে বা মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্ব্বে শব্দস্পর্শাদিতে বা নাড়ীর কিরূপ অবস্থা সংঘটিত হইয়া থাকে, এই সকল বিবরণ বিস্তৃত ভাবে আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থসকলে বর্ণিত আছে। মহামতি চরক ইন্দ্রিয়স্থানে এই অরিষ্ট প্রকরণ সন্নিবেশিত করিয়াছেন। সমস্ত ইন্দ্রিয়ের (তুষজ্বালাবৎ) যুগপৎ উত্থিত বুদ্ধিকে জীবন বা আয়ু বলে। সুতরাং ইন্দ্রিয়স্থানই যথার্থ আয়ুর্বিজ্ঞান বা আয়ুর্ব্বেদ। এই ইন্দ্রিয়স্থানে বা অরিষ্টসকলে জ্ঞান লাভ করিতে না পারিলে বৈদ্য কখনই বৈদ্যপদবাচ্য হইতে পারেন না। পৃথিবীর অপর কোন চিকিৎসাশাস্ত্রে এই অরিষ্টজ্ঞান অথচ রোগসকলের এইরূপ সাধ্যাসাধ্য যাপ্যত্ব নির্ণীত হয় নাই। সুতরাং এইটাই আয়ুর্ব্বেদের বিশিষ্টতা, শাস্ত্রকারকগণ এই সকল মরণজ্ঞাপক চিহ্নগুলির অব্যর্থতার উপর এতটা আস্থাবান্ যে, তাঁহারা বলেন যে, স্থলবিশেষে ধূম দেখিয়া বহ্নির অনুমান বৃথা হইতে পারে, অথবা স্থলবিশেষে পুষ্প দেখিয়া ফলের অনুমানও বৃথা হইতে পারে, কিন্তু অরিষ্ট লক্ষণ দেখা দিয়াছে, অথচ মৃত্যু ঘটে নাই, এরূপ স্থল কুত্রাপিও দেখা যায় না। অরিষ্টচিহ্ন দেখা দিলে মৃত্যু অনিবার্য্য, বিশিষ্ট সুপ্রযুক্ত চিকিৎসাও সে মৃত্যু নিবারণে সক্ষম নয়। গুণবান্ ভিষক্ অথবা উপস্থাতা কেহই তখন কার্য্যক্ষম হয় না। একমাত্র দৈব বা তপস্যা ব্যতীত আর কাহারও সে মৃত্যু নিবারণে ক্ষমতা নাই।

অরিষ্ট জ্ঞানের প্রয়োজন। এই অরিষ্টের বিষয় জানা থাকিলে যোগী আপনার মৃত্যু নিকটবর্ত্তী জানিয়া যোগকার্য্যে বিশেষ মনোযোগী হইতে পারেন। ভোগী বা বিষয়ী তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে আপনার বিষয় কার্য্যের সুব্যবস্থা করিতে পারেন। চিকিৎসক রোগ অসাধ্য জানিয়া চিকিৎসাকার্য্য হইতে বিরত থাকিয়া রোগের শান্তিস্বস্ত্যয়নের পরামর্শ দিতে পারেন; গৃহস্থকে চিকিৎসার জন্য ধনে

প্রাণে মজিতে হয় না। এবং রোগীও তীব্র ঔষধাদি সেবনের যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া শান্তমনে ধ্যানধারণায় অথবা তীর্থক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিতে পারেন। হিন্দুর পক্ষে মরণ দিনের ন্যায় পুণ্যজনক, মহাফলপ্রসূ দিন আর নাই। সেই মহাপ্রস্থান দিনে হিন্দু দান ধ্যান করিতে পারিলে আপনাকে সফল-জন্মা ও কৃতকৃত্য বোধ করিয়া থাকেন। এবং যে বৈদ্য তাহা পারেন, তিনি তাঁহাকে আচার্য্যবৎ পরমোপকারী বন্ধু জ্ঞান করিয়া থাকেন। হিন্দুর জপতপ সকলই সদ্গতির জন্য, সজ্ঞান মৃত্যুর জন্য; এই সজ্ঞান মৃত্যুর জন্যই ঋষিগণ তপোবলে অরিষ্ট বিজ্ঞানের আবিষ্কার করিয়াছেন। পৃথিবীর কোন জাতির মধ্যে এ জ্ঞান নাই। কোন জাতির জন্মজন্মান্তরে বিশ্বাস নাই।

যে ভাব স্মরণ করিতে করিতে জীব অন্তকালে কলেবর ত্যাগ করে, সেই ভাবানুসারেই পরকালে তাহার গতি হয়; হিন্দুশাস্ত্রের প্রেরণা এইরূপ। সুতরাং এই অরিষ্টবিজ্ঞান হিন্দুর পক্ষে পরম প্রয়োজনীয় পদার্থ। এই অরিষ্ট জ্ঞানের আলোচনায় এই শকুনবিজ্ঞান বা স্বপ্নবিজ্ঞানের আলোচনায় আপামর সাধারণেরও ঔষধ ও চিকিৎসার প্রতি একান্ত নির্ভরতা কমিয়া গিয়া জীবনীশক্তি বা আয়ুর স্বতন্ত্রতা ও জন্মজন্মান্তরে বা দৈবের প্রতি বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হইতে থাকে। কোথাও কিছু নাই, কোন কার্য্যকারণ সম্বন্ধে একটী লোক যেমন আহারবিহারাদি স্বাস্থ্য বৃত্তির-অনুশীলন করে, নিত্যই সেইরূপ স্বাস্থ্যচর্য্যা করিতেছে, শরীরের কোন গ্লানি নাই, অথচ তাহার নাসাদণ্ড হঠাৎ বক্র হইয়া পড়িল, অথবা তাহার মস্তকে হঠাৎ একটী গৃধ্র আসিয়া বসিল এবং এই ঘটনার ২।৪ দিন পরে কোন উৎকট ব্যাধি উপস্থিত হইয়া তাহাকে মৃত্যুমুখে নীত করিল, ইহা দেখিয়া সাধারণ লোকে কে না বিচার করিতে পারে যে, আয়ু বলিয়া একটী স্বতন্ত্র পদার্থ আছে, যাহা ঐহিক আহারবিহার, চিকিৎসাদি কোন কর্ম্মের অধীন নয়। যাহার অন্তঃস্থলে দৈবই বলবৎ কারণ। যাহার অন্নপানীয়ে ঘুণ, কেশ, কীট, নখ, লোম প্রভৃতি নিয়তই পরিলক্ষিত হয়, সে ব্যক্তি অসাধ্য রাজযক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে, ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া কে না স্থির করিতে পারে যে, ঐ সকল ঘুণাদি জীবাণু দৈব কর্ত্তৃকই রাজযক্ষ্মা রোগীর অন্নপানীয় দূষিত করিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছে।

রাজযক্ষ্মা উৎপত্তির পূর্ব্বে জীবাণু কর্ত্তৃক অন্নপান দূষিত হইয়া থাকে, ছাগদ্বারা আঘ্রাত হইলে যক্ষ্মাবীজাণু কর্ত্তৃক আক্রান্ত স্থানের শুদ্ধি হয়, যে জ্বরে মস্তকে সীমন্ত (সিঁথি) বা বক্ররেখা দেখা যায়, সে জ্বর অসাধ্য, স্বপ্নে সূর্য্য দর্শন হইলে যে অতি গুরুতর রোগও আরোগ্য হয়, ছায়া বা কান্তি দেখিয়া যে রোগীর শুভাশুভ বলা যাইতে পারে, ইত্যাকার জ্ঞানসকল আলোচনা করিলে মন বিস্ময়-রসে পরিপ্লুত হয় এবং এই সকল জ্ঞানের আবিষ্কারক ঋষিগণের চরণতলে আত্মবলি দিলেও মনুষ্যসমাজ তাঁহাদের ঋণ হইতে মুক্ত হইতে পারে না, এ বিষয় প্রতীতি হইয়া থাকে। আয়ুর্ব্বেদের আলোচনায় বিশেষতঃ অরিষ্টজ্ঞানের আলোচনায় স্পষ্টই অনুভূত হয় যে, আদিজ্ঞান বা বেদ কি অনন্ত কি মহা-মহিম-শক্তিশালী এবং ঐ বেদদ্রষ্টা ঋষিগণের কি বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি! মনু বলিয়াছেন, কল-

মূলাশী সংযতাত্মা ঋষিগণ তপোবলে সচরাচর ত্রৈলোক্য দেখিতে পান, তাঁহারা তপোবলেই ঔষধশাস্ত্রে বিষচিকিৎসা প্রভৃতি জ্ঞানসকল আবিষ্কার করিয়াছেন। হেতু শাস্ত্রকে আশ্রয় করিয়া ঋষিবাক্যের প্রতি সন্দিহান হইতে নাই। বাস্তবিকও আয়ুর্ব্বেদাদি শাস্ত্রসকল যে অলৌকিক জ্ঞানপ্রসূত, উহা যে পরীক্ষালব্ধ হইতে পারে না. ইহা একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যায়। ভাবিয়া দেখ, আমরা এই যে প্রতিদিন অন্নব্যঞ্জনাদি উপভোগ করিতেছি, আমাদের এই ভোজনাবিধি কি সামান্য জ্ঞানমূলক? আজও পাশ্চাত্যজগৎ শিশু-খাদ্য কিরূপ হওয়া উচিত, তাহার গবেষণা করিতেছে, কিন্তু আমাদের অন্নপ্রাশন সংস্কার সেই বৈদিক যুগের। তণ্ডুল, তিল, যবের আবিষ্কার অথবা হরিদ্রা যে পচন নিবারক, এই সকল আবিষ্কারকি অদ্ভুত বিজ্ঞানমূলক নয়? পৃথিবীতে কোটী কোটী বৃক্ষ লতা ও ওষধি আছে, তন্মধ্যে ধান্যের ন্যায় এমন একটী শস্যের আবিষ্কার যাহা প্রতিদিন খাইলে অরুচি ও স্বাস্থ্য নষ্ট হইবে না, অথচ দেহে বলাধান ও জীবন রক্ষা হইবে, ইহা কি যুগযুগান্তরের পরীক্ষাবলে নিষ্পন্ন হইতে পারে? আমাদের আহারের বিধি, শয়নবিধি, গর্ভাধানাদি সংস্কারবিধি, আমাদের আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা প্রভৃতি সমুদয়ই বেদমূলক ও অতীন্দ্রিয়, একথা আমরা অপর প্রসঙ্গে নিরূপণ করিব। পরন্তু এই নাড়ীজ্ঞান বা অরিষ্টজ্ঞান যে তপস্যাপ্রসূত, ইহা আমরা এই প্রসঙ্গে ক্রমশঃ দেখাইতে চেষ্টা করিব। নাড়ীজ্ঞান সম্বন্ধে মহর্ষি কণাদ নিজেই বলিয়াছেন যে, অল্প পুণ্যে লোকে নাড়ী পরিচয় লাভ করিতে পারে না। যোগাভ্যাসের ন্যায় একাগ্রচিত্তে ইহার জন্য তপস্যা করিতে হয়।

পরন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, অরিষ্ট-জ্ঞান বা নাড়ীজ্ঞানের চর্চ্চা বৈদ্যসমাজ হইতে ক্রমশঃ লোপ পাইতে চলিল। আয়ুর্ব্বেদে আছে যে, শাস্ত্রদ্বারা হিতায়ু, অহিতায়ু, সুখায়ু, ও দুঃখায়ু এবং আয়ুর মান প্রভৃতি জানা যায়, তাহাকে আয়ুর্ব্বেদ বলে। রক্তসার, শুক্রসার, মেদঃসার প্রভৃতি সার অথবা ব্রাহ্মসত্ব, পিশাচসত্ব, গন্ধর্ব্বসত্ব ও সাত্ম্যাদি নানা বিবেচনায় আয়ুর পরিমাণ বা জীবনীশক্তির উৎকর্ষাপকর্ষের কথা আয়ুর্ব্বেদে লিখিত হইয়াছে, তথাপি ইহি অরিষ্টজ্ঞান আয়ুর মান জানিবার বিশেষ উপায়। অগ্রে আয়ু বা জীবনীশক্তির পরীক্ষা না করিয়া ঔষধাদি প্রয়োগের ব্যবস্থা করিলে ঔষধ-ব্যাপত্তি ঘটে বলিয়া আয়ুর মান জানাই বিশেষ প্রয়োজনীয়। অরিষ্টলক্ষণদ্বারা, নাড়ী দেখিয়া রোগের সাধ্যাসাধ্যত্ব নির্ণয় করিয়া তবে চিকিৎসাকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে হয়। ঔষধ বল, চিকিৎসা বল, রোগীর জীবনীশক্তি না থাকিলে কিছুতেই কিছু হয় না। বরঞ্চ জীবনীশক্তির হ্রাসাবস্থায় ঔষধাদির প্রয়োগ বিপরীত ফলজনক হইয়া থাকে। কিন্তু আজকাল কয়জন কবিরাজ আয়ু পরীক্ষা করিয়া তবে ঔষধাদি প্রয়োগ করেন, আমাদের দেশের আবালবৃদ্ধবনিতার আজও এই সংস্কার আছে যে, অরিষ্টজ্ঞান বা নাড়ীজ্ঞানশূন্য কবিরাজ কবিরাজই নহেন। কিন্তু আজকাল কয়জন কবিরাজ অরিষ্ট দেখিয়া বা নাড়ী দেখিয়া চিকিৎসা করেন। অথবা নাড়ী দেখিয়া রোগ নির্ব্বাচন করিতে পারেন? বড় বেশী দিনের কথা নয় ৫০।৬০ বৎসর

পূর্ব্বে এদেশে এমন সব শাস্ত্রজ্ঞ কবিরাজ মহাশয়গণ বিদ্যমান ছিলেন, যাঁহারা নাড়ী দেখিয়া রোগ নির্ণয় করিতেন, যাঁহারা অরিষ্ট দেখিয়া মৃত্যুর একমাস পূর্ব্বে রোগীকে তীর্থধামে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতে পাঠাইয়া দিতেন। বাটীর প্রাচীনা গৃহিণীগণেরও নাড়ীজ্ঞান বা রিষ্টারিষ্ট বোধ ছিল। কিন্তু হায়! এক্ষণে সে বৈদ্যও নাই, সে রোগীও নাই। রোগী কত্রকদণ্ডের মধ্যে মরিয়া যাইবে—রোগী শয্যাকণ্টক অবস্থায় যাতনায় ছট্‌ফট্ করিতেছে, অথবা রোগীর নাভিশ্বাস উপস্থিত হইয়াছে, এমন সময়েও যাতনার উপর যাতনা—অরিষ্টজ্ঞান অভাবে ডাক্তার বা কবিরাজ মহাশয় হয়তো রোগীর গুহ্যদ্বার দিয়া পিচকারী দিতে বসিয়াছেন, অথবা রোগীর মৃত্যুশ্বাস বুঝিতে না পারিয়া তাহার বুকের ঘড়্‌ঘড়ানির জন্য মালিস দিতে বলিতেছেন। ডাক্তারি চিকিৎসায় এ জ্ঞান না থাকিতে পারে, ডাক্তারি ও আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসায় আকাশপাতাল প্রভেদ। কিন্তু ডাক্তারি চিকিৎসাকে পরম সত্যবোধে নাড়ীজ্ঞান বা অরিষ্টজ্ঞানকে মিথ্যাবোধ করিয়া আধুনিক বৈদ্যমহাশয়েরা থার্ম্মোমিটর ও ষ্টেথিস্কোপাদি ব্যবহারে আপনাদিগকে মহাগৌরবান্বিত বোধ করিতেছেন, এইটী বিষম দুঃখের কথা; ডাক্তারেরা তো পূর্ব্বজন্ম, পরজন্ম, আত্মা এসব কিছুই মানেন না। তাঁহারা আয়ু কি আজও তাহা নির্ণয় করিতে পারেন নাই বলিয়া অদ্যাপি তাঁহাদের চিকিৎসাশাস্ত্রকে তাঁহারা ভৈষজ্য-বিজ্ঞান বলিয়া থাকেন। তাঁহারা আজও রোগের সাধ্যাসাধ্যত্ব বা যাপ্যত্ব স্বীকার করেন না। রোগ আরোগ্যের পক্ষে কাল যে একটী বলবত্তর কারণ, একথাও তাঁহারা ততটা মানেন না। সকল রোগকেই সাধ্য মনে করিয়া ভৈষজ্যবিজ্ঞান বলে তাঁহারা পুরুষকার প্রদর্শন করিতে যান। "জাত্যায়ুঃ ভোগবিপাকাঃ" পূর্ব্বপূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলে যে জন্মভোগ ও জীবনীশক্তি বিধৃত থাকে—প্রজ্ঞাপরাধ যে সকল রোগের কারণ, অথবা আধ্যাত্মিক নিয়ম বলে যে রোগ সকল সারিতে পারে, একথা তাঁহারা বিশ্বাস করেন না। তাঁহাদের চিকিৎসা হেতুশাস্ত্রমূলক। সুতরাং নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল। অন্ধকারে হস্তোপচারে গমনশীল হাতুড়িয়ার ন্যায় তাহারা এযাবৎ পরীক্ষারাজ্যে পরিভ্রমণ করিতেছেন। সুতরাং ডাক্তারি চিকিৎসার ভিতর অরিষ্টের কথা নাই, নাড়ীবিজ্ঞান নাই, দৈবব্যপাশ্রয় চিকিৎসা নাই বলিয়া উহাদিগকে অনাবশ্যকীয় বোধে আমরা যদি উহাদের অনুশীলন না করি, তাহা হইলে আমরা কি প্রকারে বেদবিশ্বাসী বলিয়া পরিচয় দিব, এই যে কলিকাতা সহরে আজকাল অনেক মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ বিরাজ করিতেছেন, কৈ, বল দেখি নাড়ী দেখিয়া সময় বুঝিয়া তাঁহাদের মধ্যে কয়জন রোগীর গঙ্গাযাত্রার কাল নিরূপণ করিতে পারেন? কয়জন কবিরাজই বা লক্ষণদৃষ্টে রোগ অসাধ্য বুঝিয়া রোগীর আত্মীয়স্বজনকে শান্তি-স্বস্ত্যয়ন হোমাদি দৈবব্যপাশ্রয় চিকিৎসা করিতে পরামর্শ দিয়া থাকেন? আয়ুর্ব্বেদের নিদান স্থান, আয়ুর্ব্বেদের বিমানস্থান, আয়ুর্ব্বেদের শারীরস্থান, আয়ুর্ব্বেদের বায়ু, পিত্ত, কফ এবং উহাদের প্রকোপ প্রভৃতি অনুশীলন করিলে বুঝা যায় যে, আমাদের এই জন্ম কিছু নূতন আরম্ভ হয় নাই এবং আমাদের রোগ ও তাহার চিকিৎসা প্রভৃতির উপায় এই কালে

আরম্ভ হয় নাই, কত জন্মজন্মান্তরের সুকৃতি দুষ্কৃতি অনুসারে এই শরীর ধারণ ও এই শরীরের ব্যাধি বিমোচনউপায়সকল সৃষ্টির অনাদিত্ব প্রযুক্ত নিত্য। বায়ু পিত্ত, কফরূপী দেবত্রয় এই দেহে অবস্থান করিয়া জীবের সুখ, দুঃখ বিধান করিতেছেন, পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মবিপাকে মহাপাতক, অতিপাতকাদি পাপের জন্য ইহজন্মে রাজযক্ষ্মা, কুষ্ঠ, অর্শঃ, ভগন্দরাদি রোগ হয় এবং কর্ম্মজ রোগ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা উপশমিত হইয়া থাকে। কিন্তু কৈ কোথায় দেখিয়াছ কি যে, কবিরাজ মহাশয় রোগের জন্মকথন প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিতেছেন? ভিষক্, দ্রব্য, উপস্থাতা প্রভৃতি পাদচতুষ্টয় সাধকতম হইলেও তথাপি দৈব চিকিৎসা ব্যতীত অরিষ্টোপশম হইতে পারে না বলিয়া আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণ অথর্ব্ববেদে অধিক ভক্তি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন। কেননা, অথর্ব্ববেদেই দৈবব্যপাশ্রয় চিকিৎসা বর্ণিত আছে। চিকিৎসাদ্বারা সাধ্যরোগ সুসাধ্য হয়; যাপ্যরোগ যাপ্য থাকে, কিন্তু অসাধ্যের প্রতিবিধান আয়ুর্ব্বেদে নাই বলিয়াই অথর্ব্ববেদের এত সম্মান। কিন্তু হায়, যে জন্ম জন্মান্তর, আয়ুর্ব্বেদের প্রতি বিষয়ে ওতপ্রোত সেই জন্মজন্মান্তরে দেবব্রাহ্মণে বেদবেদান্তে আধুনিক কবিরাজ মহাশয়গণের বিশ্বাস নাই, তা সাধারণ লোকের কোথা হইতে থাকিবে? ভগবান্ পাতঞ্জলি আয়ুর্ব্বেদে ও জ্যোতিষশাস্ত্রে বেদের প্রত্যক্ষতার কথা বলিয়াছেন। কিন্তু হায়, যাঁহারা আয়ুর্ব্বেদের প্রচারক, তাঁহারা বেদবিশ্বাসী নন। তাঁহারা "কামোপভোগপরমা" এই সত্যেরই বিশ্বাসী। সেই জন্যই পুরাকালে বেদবিশ্বদেব ব্রাহ্মণভক্ত ব্রতধারী পুরুষ ব্যতীত আয়ুর্ব্বেদের অপর কেহ অধিকারী ছিল না। কিন্তু এক্ষণে কেহ কেহ অর্থলোভে আয়ুর্ব্বেদচর্চ্চা করাতে আয়ুর্ব্বেদের এই দুর্গতি ঘটিতেছে। আয়ুর্ব্বেদবাদিগণের মধ্যে যদি থার্ম্মোমিটার বা ষ্টেথিস্কোপ প্রচলিত হইল—তবে কে আর নাড়ীবিজ্ঞানের বা অরিষ্টজ্ঞানের চর্চ্চা করিবে? ক্রমেই উহা মিথ্যার মধ্যে পরিগণিত হইবে।

শ্রীতেজশ্চন্দ্র বিদ্যানন্দ।

মসূরিকা (বসন্ত) রোগ।

দুঃখের অনুবন্ধ ব্যতীত সুখ থাকিতে পারে না। ইহা বুঝাইবার জন্যই বোধ হয় বিধাতা বসন্ত রোগের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। নচেৎ যখন দুরন্ত শীতের অবসানে মলয় মারুত শরীরকে স্পর্শসুখ অনুভব করায়, যখন কোকিলের কাকলি এবং ভ্রমরের গুঞ্জন মানবের শ্রুতিসুখ সম্পাদন করে, যখন চ্যুত মুকুল পরিমল শত শত পুষ্পরাশির সৌরভের সহিত মিশিয়া মানবের ঘ্রাণেন্দ্রিয় চরিতার্থ করে, এমন সুখময় সময়ে এমন অসুখের সৃষ্টি কেন? নর কবির কাব্য পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া রচিত হয়। কিন্তু অমর কবির কাব্যে আমরা তাহার বিপরীত দেখিতে পাই। সে কাব্য বলে

যেখানে দুঃখ, সেখানে সুখ, যেখানে সুখ সেখানে দুঃখ। সুখ দুঃখ অন্যোন্যাশ্রয়ী হরি-হরের ন্যায় পরস্পর জড়িত।

বসন্ত রোগের শাস্ত্রীয় নাম মসূরিকা। মসূরীর (মসূর কলায়ের) ন্যায় ব্রণ উৎপন্ন হয় বলিয়া এই রোগের নাম মসূরিকা রাখা হইয়াছে। ইহা যে কি জন্য সাধারণে বসন্ত রোগ নামে খ্যাত হইয়াছে, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ এ বিষয়ের তথ্যনির্ণয়ে চেষ্টা করিতে পারেন। কিন্তু আমাদের স্বভাবতঃ মনে হয় যে, বসন্ত কালে এই রোগের প্রাবল্য ঘটে বলিয়া ইহার "বসন্ত" রূপেই নামকরণ হইয়াছে।

বসন্তরোগ জগতে অনেক কাল হইতে আছে এবং অনেক সময় অনেক দেশ শ্মশানে পরিণত করিয়াছে। মানবের প্রাণপণ চেষ্টা উপেক্ষা করিয়া এই রোগ যে আরও কতদিন জগতে বিদ্যমান থাকিবে, যিনি বসন্ত রোগের সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই তাহা বলিতে পারেন, আমরা বসন্তের অন্তরঙ্গ বন্ধু নহি। সুতরাং তাহার দীর্ঘ জীবন কামনা করি না। কিন্তু আমাদের কাম্য না হইলেই যে সে স্বল্পজীবী হইবে, এরূপ আশা করিবার কোন কারণ নাই।

বসন্তরোগ অনেক দিন হইতে পৃথিবীতে আছে এবং আশা করি থাকিবে। আর এ রোগের অস্তিত্বের পরিচয় সম্ভবতঃ আয়ুর্ব্বেদেই প্রথম প্রচারিত হইয়াছিল। কিন্তু অনেক পাশ্চাত্য চিকিৎসক এ সম্বন্ধে নিতান্ত ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। নিম্নে তাহার একটী উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে।

ডাক্তার ওসলার এবং ম্যাকরে প্রণীত চিকিৎসাগ্রন্থে ডাক্তার উইলিয়ম, টি, কাউন্সিল ন্যাক, এম,ডি, লিখিয়াছেন যে, মসূরিকা রোগের প্রকৃত পরিচয়জ্ঞাপক বিবরণ দশম শতাব্দীতে রেজেস নামক জনৈক মুসলমান চিকিৎসক লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহার বহুপূর্ব্বে চরক ও সুশ্রুত গ্রন্থে মসূরিকার লক্ষণ ও চিকিৎসা লিপিবদ্ধ হইয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়।

এক্ষণে পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্রের মতে বসন্তরোগীকে যেরূপ স্বতন্ত্র রাখিবার ব্যবস্থা করা হয়, পূর্ব্বে এরূপ ছিল কি না? বসন্ত রোগী সম্বন্ধে যেরূপ দেশাচার এখনও দেখা যায়, তাহাতে ইহার অনুকূল প্রমাণ পাওয়া যায়। এখনও যাঁহারা প্রাচীন মতের পক্ষপাতী তাঁহারা বসন্ত রোগীর গৃহে কাহাকেও যাইতে দেন না, রোগীর কাপড় রজকালয়ে প্রেরণ করেন না, এবং রোগীর গৃহ পরম পবিত্র রাখিয়া থাকেন।

কেবল দেশাচার বলিয়া নহে, শাস্ত্রেও বসন্ত রোগীকে নির্জ্জনে ও পবিত্র স্থানে রাখিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত স্পষ্টই বলা হইয়াছে :—

"ন চ তস্যান্তিকং ব্রজেৎ॥"

অর্থাৎ বসন্ত রোগীর নিকটে কেহ যাইবে না। ইহাতে বসন্ত রোগীকে স্বতন্ত্র ভাবে রাখিবার নিয়ম সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়।

বসন্তরোগ যে সংক্রামক, তাহা রোগীকে এইরূপ স্বতন্ত্র রাখিবার ব্যবস্থাদ্বারাই প্রতীত হয়। সংক্রামক না হইলে এরূপ সাবধানতার আবশ্যক কি? আবার সংক্রমণ নিবারণের বিধিও অতীব সুন্দর। পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ বলেন যে, মসূরী রোগ পাকিবার পরে বিশেষতঃ শুষ্ক হইবার সময়ে উহা হইতে অসংখ্য কণা নির্গত হয় এবং সেই সকল

কণাদ্বারা রোগ সংক্রমিত হয়। এই তথ্য লক্ষ্য করিয়াই শাস্ত্রকার উপদেশ দিয়াছেন্ :—

"পক্কে ... ধূপো মুহুর্যুক্তিতঃ।
শশ্বদ্গোময়ভস্মগুগ্গুলুমথো শুষ্কে
শিলাপিষ্টয়োরালেপঃ পিচুমর্দ্দপত্রনিশয়োঃ
শেষে ব্রণোক্তাঃ ক্রিয়াঃ)।"

অর্থাৎ বসন্তের গুটি পাকিয়া উঠিলে যুক্তিপূর্ব্বক ধূম প্রয়োগ করিবে; এবং সর্ব্বদা গোময় ভস্ম (ঘুঁটের ছাই) গায়ে মাখাইবে। শুষ্ক হইলে নিমপাতা ও হরিদ্রা শিলায় বাটিয়া প্রলেপ দিবে এবং ব্রণোক্ত ক্রিয়া করিবে।

মসূরিকা পাকিয়া উঠিলেই যাহাতে মক্ষিকাদি ক্ষতে উপবিষ্ট হইয়া রোগ সংক্রমণ করিতে না পাবে, সেই জন্য ধূম প্রয়োগের ব্যবস্থা। গ্রন্থান্তরে ইহা ব্যতীত স্পষ্টই বলা হইয়াছে :—

"সপত্রনিম্বশাখাভির্মক্ষিকামপসারয়েৎ।"

অর্থাৎ সপত্র নিম্বশাখাদ্বারা মক্ষিকা তাড়াইয়া দিবে। অপিচ, গোময়ভস্ম লেপন করিবার যে বিধি আছে, তদ্দ্বারা যে কেবল মক্ষিকা নিবারণ হয়, এমত নহে, রোগবীজ বায়ুমণ্ডলে ব্যাপ্ত হইতে পারে না অপিচ, গোময়ভস্ম বিষনাশক। বিষ ফোঁড়া হইলে গোময়ভস্ম ব্যবহারে বিষ নষ্ট হয়। সুতরাং গোময়ভস্ম সংযোগে বসন্তের বিষও নষ্ট বা হীনবীর্য্য হয়; মিশিতে পায় না। শুষ্ক হইলে নিমপাতা ও হরিদ্রা শিলায় বাটিয়া প্রলেপ দিতে বলা হইয়াছে। ইহাতে রোগবীজ কোন উপায়েই সংক্রমিত হইতে পারে না।

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, বসন্ত রোগ সংক্রামক বলিয়া জানা ছিল এবং সংক্রমণ নিবারণের ব্যবস্থাও করা হইয়াছে, কিন্তু রোগ সংক্রামক বলিয়া ত কোথাও উল্লেখ নাই। ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, আয়ুর্ব্বেদ-কারগণ সংক্ষিপ্ত ভাবে যে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, তাহা সূক্ষ্মবুদ্ধি পুরুষের জন্য। অনেক স্থলে তাঁহারা দিগ্দর্শনমাত্র করিয়া গিয়াছেন। শাস্ত্রে পুনরুক্তি বা অত্যুক্তি বড় কোথাও দেখা যায় না। রোগের সংক্রমণ সম্বন্ধে আমরা একটী মাত্র আভাস পাই :—

'প্রসঙ্গাৎ গাত্রসংস্পর্শাৎ নিঃশ্বাসাৎ
সহভোজনাৎ।'
"একশয্যাসনাচ্চৈব বস্ত্রমাল্যানুলেপনাৎ॥
জ্বরঃ কুষ্ঠশ্চ শোষশ্চ নেত্রাভিষ্যন্দ এব চ।
ঔপসর্গিকরোগাশ্চ সংক্রামন্তি নরান্নরম্॥"

অর্থাৎ—একত্র থাকা, গাত্রসংস্পর্শ, নিঃশ্বাস, একত্র ভোজন, এক শয্যা ও আসনে শয়ন ও উপবেশন এবং এক বস্ত্র, মাল্য ও অনুলেপন ব্যবহার বশতঃ জ্বর, কুষ্ঠ, শোষ, চক্ষুউঠা এবং ঔপসর্গিক রোগসকল একব্যক্তি হইতে অপর ব্যক্তিতে সংক্রমিত হয়, এই বচনটীর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বুদ্ধিমান্ চিকিৎসক, বসন্ত রোগীকে নির্জ্জনে রাখিবার, তাহার কাছে কাহারও না যাইবার প্রভৃতি যে সকল উপদেশ, শাস্ত্রে আছে তদ্দ্বারা অনায়াসেই বুঝিতে পারেন যে, রোগটী সংক্রামক।

শাস্ত্রে বসন্ত রোগের বিষয় যেরূপ লিখিত হইয়াছে, বিশেষতঃ বসন্তের টীকার বিষয় উল্লিখিত না থাকায় সহজেই মনে হয়, সে সময়ে বসন্তরোগের প্রাবল্য কম ছিল। যে কারণেই হউক পরবর্ত্তী কালে উহা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে বসন্তের টীকা লইবার প্রথার সৃষ্টি ও প্রচলন, কতকাল পূর্ব্বে কোন মনস্বী ব্যক্তি কর্ত্তৃক যে উদ্ভাবিত

প্রচলিত হয়, সে সম্বন্ধে কোন প্রমাণ আমরা পাই নাই। তবে প্রাচীনদিগের মুখে যেরূপ শুনা যায়, তাহাতে এই প্রথা বহুকাল হইতে প্রচলিত আছে, বোধ হয়। বর্ত্তমান টীকা দিবার প্রণালী উহার বহুকাল পরে আবিষ্কৃত এবং প্রচলিত হইয়াছে। ইহার পোষক স্বরূপ আর একটী অবস্থার বিষয়ের কথা এখানে উল্লেখ করা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। উহাকে "গুলসান" বলে। কোন দগ্ধ পদার্থদ্বারা মণিবন্ধের সম্মুখ ভাগে বা পদের জঙ্ঘাদেশে ক্ষত উৎপাদন করা এবং সেই ক্ষতকে রক্ষা করার নাম "গুলবসান"। এই প্রথা এখনও সুদূর পল্লিগ্রামের স্থানে স্থানে প্রচলিত আছে এবং তদ্দ্বারা অনেক কঠিন রোগের উপশম হইতে দেখা যায়। সম্ভবতঃ এই প্রথা আয়ুর্ব্বেদে প্লীহা যকৃৎ রোগে যে শিরা বিদ্ধ করিয়া রক্তমোক্ষণ করিবার উপদেশ আছে, তাহারই রূপান্তরমাত্র।

বসন্তের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য কি উপায় অবলম্বন করা সঙ্গত, এক্ষণে আমরা সেই সম্বন্ধে আলোচনা করিব। উপায়গুলি দুই জাতীয়, কতকগুলি বসন্ত রোগীর পক্ষে প্রযুজ্য এবং কতকগুলি সুস্থ-ব্যক্তির পক্ষে প্রযুজ্য। রোগীর পক্ষে প্রযুজ্য উপায়গুলির বিষয় পূর্ব্বেই অনেকটা বলা হইয়াছে, যথা—রোগীকে নির্জ্জনে রাখা, রোগীর নিকট কাহারও না যাওয়া, রোগীর বস্ত্রাদি রজকালয়ে না দেওয়া, রোগীর গৃহে যাহাতে মাছি প্রবেশ না করিতে পারে, তজ্জন্য ধূম দেওয়া, কিন্তু রোগীর নিকটে শুশ্রূষাকারী না যাইলে চলিতে পারে না। শুশ্রূষাকারীকে যখন যাইতে হইল, তখন তাহাকেও রোগীর ন্যায় দেখিতে হইবে, অর্থাৎ তাহার নিকটে কেহ যাইবে না এবং তাহার বস্ত্রাদি রজকালয়ে দেওয়া হইবে না। রজকালয়ে বস্ত্র না দিয়া বস্ত্র গরম জলে সিদ্ধ করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য, রোগীর ঘরে যে কোন ব্যক্তি প্রবেশ করিবে, তাহার বস্ত্র সম্বন্ধেও এইরূপ নিয়ম পালন করা আবশ্যক।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, পক্কাবস্থায় গোময় ভস্ম এবং সংশুষ্ক অবস্থায় নিমপাতা ও হরিদ্রা লেপন করিলে রোগ সংক্রামিত হইতে পারে না। অপিচ ঐ সকল পদার্থ বীজনাশক বলিয়া রোগবীজের রোগোৎপাদিকা শক্তি নষ্ট হয় বা কমিয়া যায়। কিন্তু তথাচ সাবধানের বিনাশ নাই। রোগীর শরীর-সংলগ্ন গোময়ভস্ম ও নিমপাতা হরিদ্রার প্রলেপ সংগ্রহ করিয়া পুড়াইয়া ফেলা বা দূরে পুঁতিয়া ফেলা কর্ত্তব্য। রোগী সম্বন্ধে এই সকল উপায় অবলম্বন করিলে রোগ আর সংক্রামিত হইতে পারে না।

এক্ষণে সুস্থ ব্যক্তির পক্ষে যে সকল উপায় অবলম্বনীয় তাহা কথিত হইতেছে। সংসারে নরের যম সকলেই—রোগও বাদ যান না; জীবনীশক্তি কমিয়া গেলে রোগ সহজেই মানব শরীরে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। সেই জন্য জীবনী শক্তি যাহাতে বর্দ্ধিত হয় অর্থাৎ শরীর যাহাতে সুস্থ এবং সবল থাকে, তাহা করা কর্ত্তব্য। এজন্য সুনিয়মে স্নানাহার করা, পবিত্র ও উৎকৃষ্ট দ্রব্য আহার করা, পচা, দূষিত ও বাসি খাদ্য আহার না করা, অতিরিক্ত আহার না করা, দিবানিদ্রা ও রাত্রি জাগরণ পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। যাহাতে বেশ কোষ্ঠ শুদ্ধি হয় তাহার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত।

(ক্রমশঃ)

ফাল্গুনের সূচী।

"আয়ুর্ব্বেদের" নিয়মাবলী।

১। আয়ুর্ব্বেদের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা, ডাক মাশুল ।৶০ আনা; আশ্বিন হইতে বর্ষারম্ভ। যিনি যে কোন সময়েই গ্রাহক হউন, সকলকেই আশ্বিন হইতে কাগজ লইতে হইবে। টাকাকড়ি কবিরাজ শ্রীযামিনীভূষণ রায় কবিরত্ন এম-এ, এম-বি, ৪৬নং বিডন্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

২। মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে "আয়ুর্ব্বেদ" প্রকাশিত হয়। যে মাসের কাগজ সেই মাসেরমধ্যে না পাইলে সংবাদ দিতে হয়। অন্যথা ঐ সংখ্যা পৃথক্ মূল্য দিয়া লইতে হইবে।

৩। প্রবন্ধ লেখকগণ কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিবেন। যে সকল প্রবন্ধ মুদ্রণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত না হয়, সাধারণতঃ সেগুলি নষ্ট করা হইয়া থাকে, তবে লেখক যদি প্রত্যর্পণ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন এবং পুনঃ প্রেরণের টিকিট পাঠান, তাহা হইলে অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ পাঠান হইয়া থাকে।

৪। গ্রাহকগণ ঠিকানা পরিবর্ত্তনের সংবাদ যথাসময়ে জানাইবেন, নতুবা অপ্রাপ্ত সংখ্যার জন্য আমরা দায়ী হইব না। "আয়ুর্ব্বেদ" সম্বন্ধে কোন বিষয় জানাইতে হইলে অনুগ্রহপূর্ব্বক গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিবেন নচেৎ কাজের বড়ই অসুবিধা হয়।

৫। রীপ্লাই কার্ড কিম্বা টিকিট না দিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না।

৬। বিজ্ঞাপনের হার—

মাসিক	এক পৃষ্ঠা	বা	দুই কলম	৮৲
,,	আধ ,,	,,	এক ,,	৪৷৷০
,,	সিকি ,,	,,	আধ ,,	২৸০
,,	অষ্টাংশ ,,	,,	সিকি ,,	১৷৷০

বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দিতে হয়, এক বৎসরের মূল্য অগ্রিম দিলে টাকায় এক আনা কম লওয়া হয়। পত্র ও প্রবন্ধাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কবিরাজ শ্রীহরিপ্রসন্ন রায় কবিরত্ন
"আয়ুর্ব্বেদ" কার্য্যাধ্যক্ষ
২৯নং ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

২৯, ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট্, অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় হইতে শ্রীহরিপ্রসন্ন রায় কবিরত্ন দ্বারা প্রকাশিত ও ১৬১ নং মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট্, গোবর্দ্ধন মেসিন্ প্রেস হইতে শ্রীহরিপ্রসন্ন রায় কবিরত্ন দ্বারা মুদ্রিত।

চৈত্র, ১৩২৩ "শরীর মাদ্যং খলু ধর্ম্ম-সাধনম্"

"অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়"

২৯. ফড়িয়া পুকুর ষ্ট্রীট,—কলিকাতা।

এক তলা

১। কায়চিকিৎসা বিভাগ।

২। শল্যচিকিৎসা বিভাগ।

৩। ঔষধালয়।

৪। বিকৃত শারীরদ্রব্য সম্ভার।

৫। ভেষজপরিচয়াগার।

৬। আফিস ঘর।

৭। ভেষজ ভাণ্ডার।

৮। শারীর পরিচয়াগার।

৯। রসশালা।

১০। বৃক্ষবাটিকা।

দো-তলা

১১—১৩। পাঠাগার।

১৪। গবেষণা মন্দির ও যন্ত্রশস্ত্রাগার।

১৫। অধ্যাপক সম্মেলন ও গ্রন্থাগার।

১৬। ঠাকুর ঘর।

মাসিকপত্র ও সমালোচক।

১ম বর্ষ। বঙ্গাব্দ ১৩২৩—চৈত্র। ৭মসংখ্যা।

সংক্রামক রোগ নিবারণে সদাচার।

আজকাল পৃথিবীর সর্ব্বত্রই সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব। কলেরা ডেঙ্গু, যক্ষ্মা, কুষ্ঠ, বিউবনিক প্লেগ, ম্যালেরিয়া জ্বর প্রভৃতি সংক্রামক রোগসকল ভীষণ মূর্ত্তিতে পৃথিবীর সর্ব্বত্রই বিচরণ করিতেছে। পাশ্চাত্য সভ্য জগতে এই সকল সংক্রামক রোগ নিবারণ জন্য কুষ্ঠাশ্রম, যক্ষ্মাশ্রম, আতুরাশ্রম, কোয়া-রাণ্টাইন্ ও সিগ্রিগেসন্ প্রভৃতি নানাবিধ আশ্রম ও আইন জারি হইতেছে। এই সংক্রামক রোগের তথ্য নির্ণয় করিতে গিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগন এই মীমাংসায় উপনীত হইয়াছেন যে, পৃথিবীতে যত প্রকার রোগ আছে, তাহার অধিকাংশই সংক্রামক। এক দেহ হইতে অন্যদেহে যায় বলিয়া সংক্রামক রোগ কখন নূতন হইতে পারে না। ঐ সকল রোগবীজাণু অনাদি কাল হইতে দেহ হইতে দেহান্তরে সঞ্চারিত হইতেছে। কেবল যে রুগ্ন ব্যক্তির দেহে ঐ সকল বীজাণু দেখিতে পাওয়া যায়, এমন নহে। সুস্থ শরীরেও ঐ সকল বীজাণু প্রচ্ছন্নভাবে বাস করে। একারণ কি সুস্থ, কি রুগ্ন সকল ব্যক্তির সংস্পর্শ হইতে দূরে থাকাই সংক্রামক রোগ হইতে অব্যাহতি পাইবার উপায়।

পূর্ব্বে পূর্ব্বে সংক্রামক রোগ সকলের সংক্রমণ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রচলিত ছিল। কিন্তু খ্রীষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে অনুবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কার হওয়াতে এক্ষণে ইহা পরীক্ষা দ্বারা স্থিরীকৃত ও সর্ব্ববাদিসম্মত হইয়াছে যে, বীজাণু দ্বারা রোগ এক দেহ হইতে অন্য দেহে সংক্রামিত হয় এবং অধিকাংশ রোগই সংক্রামক। এই সকল বীজাণু বায়ু যোগে, নিশ্বাস প্রশ্বাস সহকারে, বিষ্ঠা, মূত্র, কফ, বমন, নখ, লোম, নিষ্ঠীবন, অন্ন, জল, দুগ্ধ, পরিধেয় বস্ত্র বা ধূলিকণা অথবা মশা মাছি প্রভৃতি জীবগণ দ্বারা আর এক দেহে প্রবেশ করে। জল, স্থল, বায়ু, আকাশ প্রভৃতি সমুদয়ই এই বীজাণু দ্বারা পরিপূর্ণ রহিয়াছে। এই সকল বীজাণু যে কেবল রোগ উৎপাদন করে, তাহা নহে, পরন্তু সমুদয়

সৃষ্টিকার্য্যই এই সকল বীজাণুদ্বারা সুশৃঙ্খলে ও সুকৌশলে সম্পাদিত হইতেছে। আমাদের অন্ত্রমধ্যে এই সকল বীজাণু অবস্থান করিয়া পরিপাক ক্রিয়ার সাহায্য করিতেছে, রক্ত মধ্যে অবস্থান করিয়া রক্তকণিকা সকল শোষণ করিতেছে। মূত্রনালীতে অথবা কোষ্ঠস্থানে থাকিয়া বিষ্ঠা মূত্র ত্যাগ কার্য্যের সহায়তা করিতেছে। আবার শরীরের বহিঃপদার্থ সকলেও সর্ব্বত্র ইহাদের ক্রিয়া লক্ষিত হইতেছে। দধি-বীজাণু দুগ্ধকে দধিতে পরিণত করিতেছে, মদ্যবীজাণু শর্করাকে মদ্যে পরিণত করিতেছে। যখন কোন রুগ্ন ব্যক্তি বিষ্ঠা, মূত্র, নিষ্ঠীবন, শ্লেষ্মা, কর্ণমল বা গাত্রমল ত্যাগ করে; অথবা যদি কোন ব্যক্তি নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ বা বমন করে, নখ, লোমাদি ছেদন করে, তখন তাহার সেই বিষ্ঠামূত্র, নিষ্ঠীবন প্রভৃতি পদার্থের সহিত এই সকল বীজাণু দেহ হইতে নিষ্কাশিত হইয়া আশ্রয়ের জন্য দেহান্তর অন্বেষণ করে। সূর্য্যালোক বা পরিষ্কার বায়ুতে ইহারা অধিকক্ষণ থাকিলে মরিয়া যায়। আগাছা যেমন অন্য বৃক্ষের আশ্রয় ব্যতীত বাঁচিতে পারে না, রোগোৎপাদনকারী বীজাণুগণও তদ্রূপ দেহের আশ্রয় ব্যতীত বাঁচিতে পারে না। মনুষ্য বা জীবদেহে প্রবেশ করিয়া ইহারা রক্তবীজের ন্যায় বংশবৃদ্ধি করিতে থাকে। মনুষ্যদেহের বিভিন্ন ধাতু হইতে রস শোষণ করিয়া এই সকল বীজাণু জীবন ধারণ করে। বীজাণুগণের দেহনিঃসৃত রস অতি বিষাক্ত। ইংরাজীতে ঐ রসকে টক্‌সিন্ বলে এবং আমাদের অথর্ব্ববেদের ভাষায় উহাকে তক্‌মন্ বলে। এই বিষ হইতেই রোগের কষ্টদায়ক উপসর্গ সমূহ উৎপন্ন হইয়া থাকে। নানা প্রকার রোগের নানা প্রকার বীজাণু আছে। যক্ষ্মা, ম্যালেরিয়া, কুষ্ঠ, কলেরা প্রভৃতি রোগের বীজাণু সকল ভিন্ন ভিন্ন। দেহের মধ্যে আবার এমন অসংখ্য অসংখ্য বীজাণু বাস করিতেছে, যাহার রোগ বীজাণু সকল নাশ করিতেছে। এই সকল বীজাণু রোগ প্রতিষেধক।

এই বীজাণুতত্ত্ব আবিষ্কারের পর হইতে ডাক্তারি-চিকিৎসার গতি অন্য দিকে ফিরিয়াছে। প্রাচীনকালের ডাক্তারি পুস্তকসকল আলোচনা কর দেখিবে—চিকিৎসা বা ঔষধের কথায় সেই সকল গ্রন্থ পরিপূর্ণ রহিয়াছে। আর আজকালকার ডাক্তারি গ্রন্থসকল দেখ, দেখিবে যে ঔষধ ও চিকিৎসাকে অকিঞ্চিৎকর বোধে ডাক্তারগণ যাহাতে ঔষধ সেবন ও চিকিৎসা না করাইতে হয়, সেই পথে দিন দিন অগ্রসর হইতেছেন। তাঁহারা এক্ষণে বুঝিয়াছেন যে, রোগ হইলে ঔষধ বা চিকিৎসা দ্বারা তাহার আরাম করিবার জন্য চেষ্টা করা অপেক্ষা যাহাতে দেহে রোগ প্রবেশ করিতে না পারে, সেইরূপ আচরণ অবলম্বন করাই পরম শ্রেয়ঃ। রোগী বা সুস্থের ব্যবহৃত বস্ত্রাদি পরিধান করা অথবা কাহারও নখ, লোম, কফ, নিষ্ঠীবন না মাড়ান, কাহারও উচ্ছিষ্ট ভোজন না করা বা কাহারও আহার্য্য পাত্রসকল বিশেষরূপে শোধন না করিয়া তাহাতে ভোজন করা অথবা গৃহে আবর্জ্জনা না রাখা, কাহারও নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস গায়ে না লাগান, উত্তমরূপ পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন থাকা ইত্যাদি নানা প্রকারের সদাচারের প্রবর্ত্তন ও প্রচলন করাই এক্ষণকার ডাক্তারি পুস্তক সকলের চেষ্টা, এমন কি বিদ্যালয়ে পাছে ছাত্রগণের মধ্যে পরস্পর সংক্রমণ হয়, একারণ

আমেরিকাতে মুক্তবায়ু বিদ্যালয়েরও প্রবর্ত্তন হইয়াছে।

ভারতবর্ষের কথা। আমাদের এই আর্য্যক্ষেত্রে পূর্ব্বকালে টাইফয়েড্ জ্বর, ম্যালেরিয়া জ্বর, ডেঙ্গু, বিউবনিক্, প্লেগ, কলেরা, রাজযক্ষ্মা প্রভৃতি মহামারী সংক্রামক রোগ সকলের প্রাদুর্ভাব এত ছিল না, এমন কি আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ আধুনিক অনেক রোগের নামগন্ধ ও যে জানিতেন না, তাহা প্রাচীন গ্রন্থাদিপাঠে জানা যায়। আমাদের শাস্ত্রে বিশ্বাস না থাকাতে, আমরা সদাচার পরিত্যাগ করায়, রোগাভিসর ভিষক্গণের হস্তে এক্ষণে অধিকাংশ ভারতবাসীর চিকিৎসার ভার ন্যস্ত থাকায়, ভারত এক্ষণে দিন দিন রোগে শোকে দুঃখ দারিদ্র্যে মুহ্যমান হইতেছে। এমন কি রোগের জ্বালায় ভারতবাসীর জাতীয় অস্তিত্ব পর্য্যন্তও লোপ পাইবার সম্ভাবনা হইয়াছে। এক বঙ্গদেশে বৎসর বৎসর ম্যালেরিয়া জ্বরেই দশ বার লক্ষ লোক অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতেছে। ভারতবর্ষ এক্ষণে পৃথিবীর নানা জাতির কর্ম্মক্ষেত্র হওয়াতে নানা জাতির সমাগমে ও সঙ্ঘর্ষে ভিন্ন ভিন্ন রোগের আবাসস্থল হইয়াছে। ভারতবাসীর বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম এক্ষণে ছিন্নমূল হইয়াছে, যে ভারতবাসী আর্য্য পূর্ব্বে স্নান, পান, ভোজন, শয়ন, স্ত্রীগমন, জীবিকার্জ্জন প্রভৃতি সর্ব্ববিষয়েই সদাচার মানিয়া চলিত, স্পর্শাক্রমের ভয় করিত, আপনার আশ্রম বা বর্ণগণ্ডীর বাহিরে বাজারের কোন দ্রব্য বা কোন লোকের সংস্পর্শ রাখিত না, এক্ষণে সমাজবিপর্য্যস্ত হওয়াতে সেই আর্য্যকে প্রতিদিন পেটের দায়ে যে কত প্রকারে কত লোকের সংস্রব করিতে হইতেছে, তাহা বলা যায় না। এক্ষণে আমাদের পান ভোজন শয়ন সকলই বাজারের উপর নির্ভর করিতেছে, এমন কি আমাদের মলমূত্র ত্যাগ তাহাও দশ জনের সঙ্গে একত্র হইয়া না করিলে চলে না, সুতরাং এই গুরুতর সংক্রামক কালে সংক্রামক রোগ নিবারণ জন্য একমাত্র সদাচারই অবলম্বনীয়।

আমাদের বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র সমুদয় শাস্ত্রই সদাচারের কথায় পরিপূর্ণ, চরকাদি আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থসকলেও ঔষধ চিকিৎসার আলোচনা অপেক্ষা রোগ প্রতিষেধক সদাচারেরই অধিক আলোচনা এইরূপই হওয়া উচিত। কেন না, সুস্থের স্বাস্থ্যরক্ষা সদাচারের উপরেই নির্ভর করে। যাহাতে আয়ুলাভ করা যায়, তাহাকেই যদি আয়ুর্ব্বেদ বলি, তাহা হইলে সদাচার প্রতিপালনই আয়ুর্ব্বেদের সূক্ষ্ম তাৎপর্য্য। "আচারাল্লভতে হ্যায়ুঃ" সদাচার হইতে আয়ু লাভ করা যায়, এটী সকল শাস্ত্রেরই কথা। আজ কাল পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও সংক্রামক রোগ নিবারণ জন্য রাজ্যমধ্যে হাইজীন্ বা সদাচার প্রবর্ত্তনের উদ্দেশে রাজাকে আইন জারী করিতে বলিতেছেন, কিন্তু আমাদের এই বিশ কোটী লোকসমন্বিত আর্য্যক্ষেত্রে বহুপূর্ব্ব হইতে শাস্ত্রের অনুশাসনেই প্রতিদিন প্রতিকার্য্যে সদাচারের বশবর্ত্তী হইয়া চলিতেছে। আমাদের সমাজকে সদাচারপ্রধান দেখিয়া পূর্ব্বে যে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ আমাদিগকে বিদ্রূপ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদেরই বংশধরেরা আজ হিন্দুর সদাচারের ভূয়সী প্রশংসা করিতেছেন। মিল্ প্রভৃতি পাশ্চাত্য ইতিহাসলেখকগণ আমরা সদাচারের অধীন দেখিয়া একদিন লিখিয়াছিলেন, যে অহো ব্রাহ্মণের কি দৌরাত্ম্য! ভারতবাসী

কি পরাধীন! খাওয়া শোওয়া সম্বন্ধেও ভারতবাসীকে পরাধীন হইয়া চলিতে হয়। কোন্ দিন কি খাইতে আছে বা নাই, অথবা শৌচক্রিয়ায় কতবার হস্তমৃত্তিকা ব্যবহার করিতে হইবে, এসকল তুচ্ছ বিষয়েও হিন্দুকে ব্রাহ্মণের মুখাপেক্ষী থাকিতে হয়। পরন্তু এক্ষণে আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, সদাচারের অভাব হেতুই আমাদের এত রোগ শোক।

ঋষিগণের বীজাণুভাবনা ছিলেন। আবার এই যে বীজাণু কর্ত্তৃক রোগের সৃষ্টি প্রমাণ করিয়া লোকে ইঁহাকে নূতন আবিষ্কার বলিয়া মনে করিতেছে, কিন্তু স্মরণাতীত কাল হইতে ঋষিগণ এ তত্ত্ব জানিতেন বলিয়াই আমাদের দেশে শৌচাচারের এত বন্ধন। প্রাতঃকালে উঠিয়াই গৃহিণীগণকে গৃহমার্জ্জন করিতে হইবে, গৃহের আবর্জ্জনা সকল দূর করিতে হইবে, গৃহসকল গোময়দ্বারা উপলেপন করিতে হইবে, বাসন সকল ধৌত করিতে হইবে, কোন বাসনকে বা ভস্ম দিয়া মাজিতে হইবে, তামার বাসনকে যে অম্ল দিয়া মাজিতে হইবে, শৌচাচারের সময় পায়ুদেশ ও হস্তপদ মৃত্তিকা ও জলদ্বারা শোধন করিতে হইবে, জালীয় জল যে মাড়াইতে নাই কফ, মল মূত্রাক্ত দ্রব্য যে স্পর্শ করিতে নাই, পরের পরিহিত বস্ত্রাদি যে পরিধান করিতে নাই, অস্থিসকল যে মাড়াইতে নাই, রৌদ্রে দিলে যে বিছানা মাদুর শুদ্ধ হয়, ইত্যাকার আর্য্যসমাজের সমুদয় আচরণের মূলেই বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নিহিত আছে। আর্য্যগণের দেহ শুদ্ধি, দ্রব্য শুদ্ধি, আহার শুদ্ধি, পানীয় শুদ্ধি, ভূমিশুদ্ধি, বস্ত্র শুদ্ধি, সূতিকাশৌচ, স্রাবাশৌচ, জননাশৌচ, মরণাশৌচ প্রভৃতি সমুদায় শুদ্ধি ও অশৌচের মূলে নানা প্রকারের বৈজ্ঞানিক তথ্যসকল নিহিত। বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র সমুদয় শাস্ত্র আলোচনা করিলেই দেখা যায় যে, তাঁহারা জীবাণুতত্ত্ব বিশেষরূপে অবগত ছিলেন। আমরা যে দেবকার্য্য করিবার পূর্ব্বে "অপসর্পন্তু তে ভূতাঃ" বলিয়া ভূতাপসরণ করি, হোমের পূর্ব্বে স্রুক্‌স্রুবাদি অগ্নিতে উত্তপ্ত করিবার সময় "নিষ্টপ্তা অরাতয়ঃ" অর্থাৎ অরাতিগণকে দগ্ধ করিলাম বলি, শ্রাদ্ধের সময় যে "নিহন্মি সর্ব্বং যদমেধ্যবদ্ভবেৎ" অর্থাৎ সমুদয় অপবিত্রতাজনক অসুর দানবাদি নষ্ট করিবার জন্য পিণ্ডপাতিবার স্থান মার্জ্জনা করিতেছি বলি, অথবা কুশণ্ডিকার সময় যে "ইদং ভূমের্ভজামহং" অর্থাৎ হে ভূমি অত্রস্থ শত্রুসকল নাশ কর, আমি তোমার শরণাগত ইত্যাদি বলি, অথবা প্রতিদিন যে সূর্য্যদেবকে "বিশ্বদৃষ্টং অদৃষ্টহা" অর্থাৎ অদৃষ্ট আয়ুরাদিনাশক বলিয়া স্তব করি, অথবা ভোজন করিবার পূর্ব্বে পঞ্চার্দ্র হইয়া ভোজন করি, কেশ ও নখলোমের ভিতর পাপ প্রচ্ছন্ন থাকে বলি যে দ্রব্য স্বাভাবিক মিষ্ট, কিন্তু কালসহকারে অম্লতা প্রাপ্ত হয়, সেই শুক্ত দ্রব্য খাই না, অথবা যাতযাম বা বাসী জিনিষ খাই না ইত্যাকার আমাদের সমুদয় সদাচারের মূলে বীজাণুতত্ত্ব নিহিত আছে। অথচ আধুনিক জড়বাদী পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের ন্যায় তাঁহারা জীবাণুকেই রোগসৃষ্টির একমাত্র সর্ব্বেসর্ব্বা কারণ বলেন নাই। তাঁহারা জীবাণুতত্ত্ব অবগত থাকিলেও প্রজ্ঞাপরাধ বা অধর্ম্মকেই রোগোৎপত্তির মূল কারণ বলিয়াছেন।

আধুনিক পণ্ডিতগণ্ বলেন যে, কলেরার বা প্লেগের বীজাণু দেহে থাকিলেই যে কলেরা বা প্লেগ্ হইবে, তাহা নহে। পরন্তু বীজাণু

দেহে না থাকিলে যে কলেরা বা প্লেগ হয় না, এইটী সুনিশ্চিত। সুতরাং পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের বচনানুসারে আমরা দেখিতে পাই যে, বীজাণুর প্রেরণাও অদৃষ্ট বা দৈবাধীন। আমরাও বীজাণুকে সর্ব্বোপরি প্রাধান্য না দিয়া আমরা রোগসৃষ্টির পক্ষে অধর্ম্মকেই প্রধান কারণ বলি। এবং ধর্ম্মাধর্ম্মের নিয়ন্তা রুদ্রদেবের কোপকেই রোগোৎপত্তির মূল কারণ বলি। যিনি আমাদিগকে রোদন করান বা দুঃখ দেন, তাঁহাকে আমরা রুদ্র বলি। আমাদের শাস্ত্রে রুদ্রকেই সংহারকর্ত্তা বলে। যখন জনপদ অধর্ম্মবহুল হয়, তখন রুদ্রদেবই সংহারমূর্ত্তি ধারণ করিয়া বায়ু, মেঘ, জল, মৃত্তিকা প্রভৃতির বিকৃতি উৎপাদন করিয়া জনপদ ধ্বংস করিয়া থাকেন। এই রুদ্রের দুই মূর্ত্তি, শিবময় ও অশিবময়। যজুর্ব্বেদের রুদ্রাধ্যায়প্রকরণে জানা যায় যে, মহারুদ্রের অনুচরেরাই সূক্ষ্ম রুদ্রগণ। তাঁহারাই মহারুদ্রের আদেশে লোকসকলকে ধ্বংস করিয়া থাকেন। এই সকল চর্ম্মচক্ষুর অগোচর সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রুদ্রগণের যেরূপ বর্ণনা আছে, যদিও আধুনিকগণের জীবাণুর সহিত তাহার সম্পূর্ণ সাদৃশ্য নাই, তথাপি বোধ হয় যেন কতকটা সাদৃশ্য আছে। কোথায় অনুবীক্ষণের দৃষ্টি, আর কোথায় বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি।

যাহা হউক, আমরা শাস্ত্রীয় মতে প্রত্যেক বিষয়ের শৌচাশৌচ এবং শুদ্ধিঅশুদ্ধির ক্রমশঃ বিচার করিয়া এই প্রসঙ্গের শেষ করিব এবং সদাচার যে কেবল সুস্থের স্বাস্থ্যরক্ষার উপায়, এমন নহে, পরন্তু রোগীর রোগোপশমের পক্ষেও যে ইহা প্রধান সহায় তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিব।

শ্রীতেজশ্চন্দ্র বিদ্যানন্দ।

মসূরিকা।

যে কোন জমিতে বীজ বপন করিলেই ফসল হয় না। জমী রীতিমত কর্ষণ করিয়া বীজ বপন করিলে তবে ফসল হয়। আবার বালিতে বা পাথরের উপর বীজ বপন করিলে তাহা কখনই অঙ্কুরিত হয় না, কালে নষ্ট হইয়া যায়। রোগ সম্বন্ধেও এইরূপ নিয়ম। রোগের বীজ সকল শরীরে সমান ভাবে রোগ উৎপন্ন করিতে পারে না। কর্ষিত জমির ন্যায় শরীর যদি দূষিত হইয়া থাকে এবং রোগ প্রতিষেধক শক্তি যদি কমিয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলে রোগবীজ সহজেই রোগ উৎপন্ন করিতে পারে, কিন্তু শরীর সুস্থ, সবল ও নির্ম্মল হইলে এবং রোগ প্রতিষেধক শক্তি প্রবল থাকিলে রোগ উৎপন্ন করিতে পারে না বা সামান্য ভাবে পারে। প্রকৃতির পালনী শক্তি যদি এইরূপে প্রাণিদিগকে রক্ষা না করিত, তাহা হইলে এতদিন রোগাক্রান্ত হইয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হইত।

পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে যে, বসন্ত রোগের সংক্রামকতা আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণের সুবিদিত ছিল। তথাপি বসন্ত রোগের নিদান (কারণ) সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে যে কটু, অম্ল, লবণ ও ক্ষার পদার্থ অতিরিক্ত ভোজন, বিরুদ্ধ ভোজন যেমন মৎস্য ও দুগ্ধ একত্রে ভোজন, পূর্ব্বাহার অজীর্ণ সত্ত্বে ভোজন, দুষ্ট পচা বাসী,

দূষিত খাদ্য ভোজন, অতিরিক্ত শাক* সিম প্রভৃতি ভোজন, দুষ্ট জল পান, দুষ্ট বায়ু-সেবন প্রভৃতি কারণে বসন্ত রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই নিদান কি? ভূমির পক্ষে যাহা কর্ষণ, শরীরে রোগোৎপত্তির পক্ষে এই নিদান তাহাই। ঐ সকল দ্রব্য অতিরিক্ত সেবনে শরীরস্থ রক্ত, পিত্ত এবং কফ দূষিত হয়। সেই দূষিত শরীরে রোগবীজ প্রবিষ্ট হইয়া সহজেই রোগ উৎপন্ন করিতে পারে। আয়ুর্বেদ মতে ইহাকে বাতিক নিদান বলে। বোধ হয় ডাক্তারেরা ইহাকে exciting cause বলিয়া থাকেন।

এই স্থলে নিদানোক্ত আর একটী বিষয়ে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। নিদানে লিখিত হইয়াছে যে "প্রদুষ্ট পবন" বসন্ত রোগের নিদান। দুষ্ট শব্দ প্রয়োগ না করিয়া প্রদুষ্ট শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে। সংস্কৃতানভিজ্ঞ পাঠকের বোধার্থ বলিতে হইতেছে যে, সংস্কৃত ভাষায় বৃথা কোন শব্দের প্রয়োগ করা হয় না। "প্র" উপসর্গের অনেকগুলি অর্থ আছে, সম্ভবত এখানে "অত্যন্ত" অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। এক্ষণে কথা হইতেছে যে, কিসের দ্বারা অত্যন্ত দুষ্ট পবন বসন্ত রোগ উৎপন্ন করিয়া থাকে? অতিরিক্ত জলীয় বাষ্প দ্বারা হইলে সর্দ্দি কাস হয়, বসন্ত রোগ হয় না। অত্যন্ত ধূম দ্বারা দূষিত হইলে, শ্বাস কাস হইতে পারে। তবে কিসের দ্বারা দূষিত? বসন্ত রোগের বীজের দ্বারা—এইরূপ মীমাংসাই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রের মতেও বসন্ত রোগের বীজ বায়ু দ্বারা বাহিত হয়। এই তথ্য যে বহু পূর্ব্বে আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণ অবগত ছিলেন, এতদ্দ্বারা তাহা প্রমাণিত হইতেছে।

কেহ বলিতে পারেন যে, এক প্রকার হইল বটে, কিন্তু বহু কষ্টে আর বড় অস্পষ্ট। তাঁহারা একবার ভাবিয়া দেখিবেন যে, আর্য্য ঋষিগণ প্রণীত যাবতীয় শাস্ত্রের কি দুরবস্থা। শাস্ত্রের বিমল জ্ঞান এক্ষণে আমাদের অজ্ঞানতায় সমাচ্ছন্ন। জানি না কতদিনে আবার আমরা সে জ্ঞান ফিরিয়া পাইব। শাস্ত্রের সকল তথ্যই এক্ষণে আমাদের নিকট অস্পষ্ট, জানি না কবে আবার তাহা স্পষ্টরূপে আমাদের চক্ষে প্রতিভাত হইবে।

কোন রোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে যে সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহাকে পূর্ব্বরূপ বলে। বসন্ত হইবার পূর্ব্বে প্রবল জ্বর, অত্যন্ত গাত্রবেদনা ও কখন কখন মাথার যন্ত্রণা হয় এবং শরীর বিশেষতঃ মুখ রক্তাভ হইয়া থাকে। সাধারণতঃ এই গুলিই দেখা যায়। আয়ুর্ব্বেদে লিখিত হইয়াছে যে, জ্বর, কণ্ডু, গাত্রভঙ্গ, কার্য্যে অপ্রবৃত্তি, ভ্রম (যেন চাকার উপর চড়িয়া আছি বোধ হওয়া), ত্বকের শোথ, শরীরের বিবর্ণতা এবং নেত্ররোগ হয়। এ স্থলে জানা উচিত যে, পূর্ব্বরূপের সমস্ত লক্ষণই সর্ব্বত্র প্রকাশ পাইবে এমন কোন নিয়ম নাই। কতকগুলি প্রকাশ

---

* আয়ুর্ব্বেদের শাক অর্থে "তরকারী" বুঝায়। শাক পাঁচ প্রকার, ১। পত্রশাক নটে, পালম, প্রভৃতি। ২। পুষ্পশাক—সজিনা ফুল, কুমড়া ফুল, প্রভৃতি। ৩। ফল শাক—লাউ, কুমড়া, বেগুণ প্রভৃতি। ৪। নালশাক—কচু ডাঁটা, লাউ ডাঁটা, পুঁইডাঁটা প্রভৃতি। ৫। কন্দশাক—ওল, কচু, আলু প্রভৃতি। আয়ুর্ব্বেদ মতে শাক সুখাদ্য নহে।

শাকেষু সর্ব্বে সুমিবসন্তি রোগাঃ। তে হেতবো দেহ বিনাশকাঃ অর্থাৎ শাকে দেহনাশের হেতুভূত রোগ সকল বাস করে। পরে এ সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা যাইবে।

পাইয়া থাকে। অপিচ, পূর্ব্বরূপের লক্ষণগুলি যত অধিক আর যত প্রবলভাবে প্রকাশ পায়, রোগ ততই কঠিন হয়। আর যত অল্প ও সামান্যভাবে প্রকাশ পায়, রোগ তত মৃদু হয়। কিন্তু পূর্ব্বরূপ সামান্য ভাবে প্রকাশ পাইবার পর যদি অপর কোন উত্তেজক কারণের সংযোগ ঘটে, তাহা হইলে রোগ প্রবল হইতে পারে।

চিকিৎসাকার্য্যের সৌকর্য্যার্থ বসন্ত রোগের চারিটী অবস্থা নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

(১) জ্বরাবস্থা—এই সময় প্রবল জ্বর হয়, কিন্তু গুটি নির্গত হয় না।

(২) নির্গমনাবস্থা—গুটি বাহির হইতে আরম্ভ হইয়া সমস্ত বাহির হওয়া পর্য্যন্ত।

(৩) পক্কাবস্থা—পাকিতে আরম্ভ হইয়া পাকা শেষ হওয়া পর্য্যন্ত।

(৪) শুষ্কাবস্থা—শুকাইতে আরম্ভ হইয়া শেষ হওয়া পর্য্যন্ত।

ক্রমশঃ প্রত্যেক অবস্থার বিষয় আলোচনা করা যাইতেছে।

(১) যে সময়ে দেশে বসন্তের প্রকোপ হয়, সেই সময়ে কাহারও জ্বর, গাত্রবেদনা, মস্তকের যন্ত্রণা হইলে এবং মুখ রক্তাভ হইলে বসন্ত হওয়াই সম্ভব। এরূপ ক্ষেত্রে রোগীকে নিবাত স্থানে রাখিবে, জল স্পর্শ করিতে দিবে না এবং উপবাস করাইবে। ক্ষুধা, পিপাসা ও মুখ শোষ থাকিলে এবং বৃদ্ধ ও বালকদিগকে জলসাগু বা জল বার্লি পথ্য দিবে। খদির কাষ্ঠ ১ তোলা ও পীতশাল (অভাবে অনন্তমূল) ১ তোলা /৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া /২ দুই সের থাকিতে নামাইবে এবং শীতল হইলে ছাঁকিয়া পান করিতে দিবে। খদিরকাষ্ঠ হরিদ্রা ও বহেরা (অভাবে হরিদ্রা) ঐরূপ নিয়মে সিদ্ধ করিয়া শৌচকার্য্যে প্রয়োগ করিবে। বসন্ত রোগের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত পান ও শৌচকার্য্যে এইরূপ জল ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

পূর্ব্বে যে বমন বিরেচনের কথা বলিয়াছি এই অবস্থায় তাহা প্রয়োগ করিবে। রোগী দুর্ব্বল হইলে সহ্যমত অল্প মাত্রায় বমন বিরেচন করাইবে। বমন বিরেচন আদৌ সহ্য না হইলে করোলাপাতার রস দুই তোলা ও হরিদ্রাচূর্ণ এক সিকি একত্র মিশ্রিত করিয়া নিত্য একবার করিয়া সেবন করাইবে। প্রথমে এই সকল নিয়ম পালন করিলে বসন্ত রোগ প্রবল হইতে পারে না। পূয ও বেদনা অল্প হয় এবং উপসর্গ উপস্থিত হয় না।

(২) এই অবস্থায় পথ্য প্রয়োগ রোগীর অবস্থার উপর নির্ভর করে। জ্বরের প্রাবল্য যতদিন থাকে, ততদিন অনাহার নিষিদ্ধ। জলসাগু, খৈ, জলবার্লি, কিসমিস, খেজুর, মিষ্ট দাড়িম ও মুগের যষ পথ্য। জ্বর কমিয়া গেলে বা ছাড়িয়া গেলে অবস্থা ও পরিপাকশক্তি বুঝিয়া পুরাতন চাউলের অন্ন, ছোলা, মুগ বা মসূর দালের যূষ, পলতা, করলা, কাঁকরোল, কাঁচকলা প্রভৃতি পথ্য দেওয়া যাইতে পারে।

এই অবস্থায় প্রথমেই নিম্নলিখিত ঔষধের দুই একটী ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। (১) কুমুরিয়া লতা দুই তোলা ৩২ তোলা জলে সিদ্ধ করিয়া আট তোলা থাকিতে নামাইবে। অপর, হিং অল্প ঘৃত সংযোগে লৌহপাত্রে অল্প ভাজিয়া লইবে। পূর্ব্বোক্ত কাথে এই হিংচূর্ণ এক আনা বা দুই আনা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে। (২) জয়ন্তীবীজ এক সিকি বাসি জলে বাটিয়া কিঞ্চিৎ ঘৃত সহ

প্রয়োগ করিবে। (৩) সুপারীর মূল এক সিকি পঁচিশটি মরিচের সহিত বাটিয়া বাসি জলের সহিত খাওয়াইবে। (৪) এক সিকি ময়না মূল ২৫টী মরিচের সহিত বাসি জলের সহিত খাওয়াইবে। (৫) এক সিকি নাটা করঞ্জের মূল ২৫টী মরিচের সহিত বাটিয়া বাসি জলের সহিত খাওয়াইবে।

তিন চারি দিন এইরূপ ঔষধ প্রয়োগের পর দোষ ও অবস্থাভেদে চিকিৎসা করিবে। দোষভেদে কিরূপ লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহা লিখিত হইতেছে।

বাতজ বসন্ত রোগে—স্ফোট অরুণ বা শ্যাম বর্ণ, তীব্রবেদনাযুক্ত ও কঠিন হয় এবং বিলম্বে পাকে। পিত্তজ বসন্ত রোগে—স্ফোট রক্ত, পীত বা কৃষ্ণবর্ণ হয়, উহাতে দাহ ও তীব্র বেদনা থাকে, শীঘ্র পাকে, সন্ধি, অস্থি ও পর্ব্বসমূহে ভঙ্গবৎ বেদনা হয়, তালু, ওষ্ঠ ও জিহ্বা শুকাইয়া যায়, এবং তৃষ্ণা, অরুচি, কাস, কম্প, অস্থিরতা ও অত্যন্ত শ্রান্তি বোধ হয়।

রক্তজ বসন্ত রোগে—মলভেদ, গাভাঙ্গা দাহ, তৃষ্ণা, অরুচি ও তীব্র জ্বর হয়, চক্ষু লাল হয়, মুখে ক্ষত হয় এবং স্ফোটসকল পিত্তজ বসন্তের ন্যায় লক্ষণযুক্ত হয়।

কফজ বসন্ত রোগে—স্ফোট সকল শ্বেত বর্ণ. স্নিগ্ধ, স্থূল, কণ্ডূযুক্ত ও অল্প বেদনাযুক্ত হয়, বহু পরিমাণে উৎপন্ন হয়, বিলম্বে পাকে, এবং কফ প্রসেক, শরীর আর্দ্র বস্ত্রাবৃতবৎ বোধ হওয়া, মস্তক বেদনা, শরীরের গুরুতা, বমনাভাব, অরুচি তন্দ্রা ও আলস্য উপসর্গ ঘটে।

সন্নিপাতজ (ত্রিদোষজ) বসন্ত রোগে—স্ফোট সকল প্রবালের ন্যায়, পাকা জামের ন্যায়, মসিনার ন্যায় হইতে পারে। সাধারণতঃ চিড়ের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট, বিস্তীর্ণ, নীলবর্ণ, মধ্যস্থলে নীচু ও অত্যন্ত যন্ত্রণাবিশিষ্ট হয়, বিলম্বে পাকে, দুর্গন্ধ স্রাব হয় এবং বহু পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহা অসাধ্য। চর্ম্মদল নামক বসন্ত রোগে অরুচি, প্রলাপ, স্তম্ভ এবং কণ্ঠরোধ উপসর্গ ঘটে।

রসরক্তাদি ভিন্ন ভিন্ন ধাতুকে আশ্রয় করিয়া বসন্ত রোগের ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ প্রকাশ পায়, তন্মধ্যে ত্বক্ আশ্রয় করিয়া যে বসন্ত রোগ উৎপন্ন হয়, তাহাতে জলবুদ্বুদের ন্যায় স্ফোট উৎপন্ন হয় এবং উহা বিদীর্ণ হইলে জলবৎ পদার্থ নিঃসৃত হয়। ইহা অল্প দোষযুক্ত হইয়া থাকে। সাধারণে ইহা জল বসন্ত বা পানিবসন্ত নামে খ্যাত।

বসন্ত রোগের যে চারিটী অবস্থার কথা বলা হইয়াছে, তন্মধ্যে প্রথম অবস্থা ৩।৪ দিন থাকে, তাহার পর প্রথমে কপালে পরে হাতের কব্জির ভিতর দিকে বসন্ত বাহির হয়। ইহার ২।৪ ঘণ্টার মধ্যে মুখে, হাতে পায়ে এবং শরীরের অন্যান্য স্থানে প্রচুর গুটি বাহির হয়। গুটি বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গে জ্বর ছাড়িয়া যায় এবং রোগী সুস্থতা বোধ করে। দ্বিতীয় অবস্থা ৩।৪ দিন, ইহার পর তৃতীয় অবস্থা। গুটিগুলি প্রথমে উজ্জ্বল রক্তবর্ণ থাকে। জন্মিবার ২।১ দিন মধ্যে একটু চাপা গোলাকার ফোস্কার ন্যায় হয়। ইহার দুই একদিন পরেই পাকিয়া উঠে। সঙ্গে সঙ্গে জ্বর হয়, গুটির ভিতর পূয জমে বলিয়া শ্বেতাভ হরিদ্রাবর্ণ দেখায়। তৃতীয় অবস্থা ৩।৪ দিন থাকে। ইহার পর বসন্ত হইবার একাদশ বা দ্বাদশ দিনে গুটি শুকাইতে আরম্ভ হয় এবং জ্বর চলিয়া যায়। ইহাই চতুর্থ অবস্থা। এই অবস্থা ৩।৪ দিন থাকে। সাধারণতঃ বসন্ত রোগ এইরূপ ভাবেই প্রকাশ

পাইয়া থাকে। কিন্তু কখন কখন ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। নিম্নে একটী প্রমাণ দেওয়া যাইতেছে।

একজন ধনবানের গৃহে চিকিৎসার্থ আহূত হই। রোগী দেখিবার পর সেই বাটীর জনৈক কর্ম্মচারীর ২৪।২৫ বৎসরবয়স্ক পুত্র আসিয়া বলে, দেখুন দেখি, গায়ে এগুলি কি বাহির হইয়াছে? দেখিয়া বসন্ত বলিয়া বোধ হইল এবং তাহাই বলিলাম। সে সময়ে আমি বসন্ত রোগের চিকিৎসা করিতাম না। সেই জন্য বলিলাম যে, এ বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতা কম, আর কাহাকেও দেখাও। তাহারা একজন বসন্ত চিকিৎসককে দেখাইল। সে ব্যক্তি বসন্ত বলিয়া স্থির করিল এবং ঔষধ দিল। ঔষধ লইয়া রোগী দেশে চলিয়া গেল। সেখানে কোনও কিছু হইল না। ৮।১০ দিন দেশে থাকায় অনেকে রহস্য করিয়া বলিল, তোমার চুলকাণী হইয়াছে, অথচ বসন্তের দোহাই দিয়া বাড়ীতে বসিয়া আছ। ইহার ২।১ দিন পরেই রোগী কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল, আসিবার ২।৩ দিন পরে ভয়ঙ্কর বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইল। এই রোগেই তাহার মৃত্যু হয়।

বসন্ত রোগের দ্বিতীয়াবস্থার প্রথমে যে সকল ঔষধ প্রযোজ্য তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। দ্বিতীয়াবস্থার শেষের দিকে নিম্ন লিখিত ঔষধসমূহের মধ্যে যে কোন একটী ঔষধ অবস্থা বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করিবে।

(১) রুদ্রাক্ষচূর্ণ এক আনা ও মরিচ চূর্ণ এক আনা বাসি জল সহ সেবন করিলে বসন্ত ভাল হয়।

(২) হরিদ্রাপত্র ও তেতুলপত্র পেষণ করিয়া শীতল জল সহ সেবন করিলে বসন্ত রোগ নষ্ট হয়।

(৩) নিম্বাদি—নিমছাল, ক্ষেৎপাপড়া, আকনাদি, পলতা, কট্‌কী, বাসকছাল, দুরালভা, আমলকী বেণারমূল, শ্বেতচন্দন ও রক্তচন্দন ইহাদের কাথে চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে ত্রিদোষ বসন্ত রোগ নষ্ট হয় এবং যে সকল বসন্ত উঠিয়াই বসিয়া যায়, তাহারা পুনঃ প্রকাশিত হইয়া থাকে।

(৩) তৃতীয় অর্থাৎ পক্কাবস্থা—বসন্ত পাকিতে আরম্ভ হইলে শোষক পথ্য ও ঔষধ না দিয়া পুষ্টিকারক ঔষধ ও পথ্য দিবে। এই সময় কিস্‌মিস, দাড়িম, মাষকলায়ের যূষ, ঘৃত, চিনি প্রভৃতি পথ্য দিতে হয়। শোষক ঔষধ দিলে পাকোন্মুখ দোষ শুষ্ক ও অন্তঃপ্রবিষ্ট হইলে রোগ কঠিন হইয়া পড়ে। সেই জন্য পুষ্টিকর, রসবর্দ্ধক, পবিত্র ও লঘুপাক পথ্য দেওয়া উচিত। জ্বর না থাকিলে অন্নপথ্য দেওয়া যাইতে পারে। দুগ্ধ এই সময়ে সুপথ্য।

নিম্নলিখিত ঔষধগুলির যে কোন একটী অবস্থা বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করিবে।

(১) গুলঞ্চ, যষ্টিমধু, কিসমিস ও ইক্ষুমূল সমান ভাগে মোট দুই তোলা লইয়া ৩২ তোলা জলে সিদ্ধ করিয়া ৮ তোলা থাকিতে নামাইবে। অনন্তর ছাঁকিয়া উহার সহিত দাড়িমের রস ও ইক্ষু গুড় দুই তোলা মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে। ইহাতে বসন্ত শীঘ্র পাকে এবং বায়ুবৃদ্ধি হইতে পারে না।

(২) কুলের আঁটির শাঁস চূর্ণ এক সিকি দুই তোলা ইক্ষু গুড় সহ সেবন করিলে বসন্ত শীঘ্র পাকে।

(৩) গুলঞ্চ, যষ্টিমধু, রাস্না, শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, রক্তচন্দন, গাম্ভারীফল, বেড়েলার মূল ও বৈঁচি ইহাদের

ক্বাথ করিয়া বাতজ বসন্ত রোগের পাক কালে প্রয়োগ করিবে।

(৪) কিসমিস, গাম্ভারীফল, খেজুর, পলতা, নিমছাল, বাসকছাল, আমলকী ও দুরালভা ইহাদের ক্বাথে খৈ চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া পিত্তজ বসন্তেও ইহা প্রযোজ্য।

বসন্ত পাকিতে আরম্ভ করিলেই গোময় ভস্ম গায়ে মাখাইবে। ফোটে অত্যন্ত ক্লেদ হইলে পঞ্চবল্কল চূর্ণ করিয়া প্রয়োগ করিবে। এই সময়ে নানা প্রকার উপসর্গ ঘটিয়া থাকে। সেই সকল উপসর্গের চিকিৎসার বিষয় কথিত হইতেছে।

রোগীর পেটফোলা ও পেটে যন্ত্রণা থাকিলে এবং বায়ু কর্ত্তৃক কম্পমান হইলে জাঙ্গল প্রাণীর মাংসের যূষ সৈন্ধব লবণ সংযোগে প্রয়োগ করিবে। অরুচি হইলে দাল বা মাংসের যূষ অম্ল দাড়িমের রস মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিবে।

মুখ ও কণ্ঠের মধ্যে বসন্ত হইলে জাতীপাতা, মঞ্জিষ্ঠা, দারুহরিদ্রা, সুপারী, শাঁই গাছের ছাল, আমলকী ও যষ্টিমধুর ক্বাথ করিয়া গণ্ডুষ (আকণ্ঠ মুখে ধারণ) করিতে দিবে। পিপুল ও হরীতকী চূর্ণ মধু সহ সেবন করিলেও কণ্ঠ বিশুদ্ধ হয়। খদিরাষ্টক-পাচনে শোধিত গুগ্‌গুলু এক সিকি প্রক্ষেপ দিয়া সেচন করিলেও উপকার হয়।

চক্ষুতে বসন্ত হইলে গুলঞ্চ ও যষ্টিমধু সমভাগে বাটিয়া একটী পরিষ্কার কাপড়ে বাঁধিবে এবং উহা নিংড়াইয়া চক্ষু মধ্যে রস দিবে। যষ্টিমধু, হরিতকী, আমলকী, বহেড়া, মূর্ব্বা, দারুহরিদ্রার ছাল, নীলোৎপল, বেনার মূল, লোধ ও মঞ্জিষ্ঠা বাটিয়া উপরোক্ত প্রকারে তাহার রস চক্ষু মধ্যে দিলে এবং চক্ষুর পাতার উপর বাটিয়া প্রলেপ দিলে যন্ত্রণা নষ্ট হয়।

শিরীষ, যজ্ঞডুমুর, অশত্থ, শেলু ও বট ইহাদের ছাল সমভাগে বাটিয়া ঘৃত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে জ্বালা নিবারিত হয়। তেলাকুচার পাতার রস কাঁচা হলুদ একত্র ছেঁচিয়া তাহার রস লাগাইবে; এই ঔষধটী বিশেষ পরীক্ষিত। ডাক্তারী লোশন বোতল বোতল ব্যবহার করিয়া যেখানে ফল হয় না, সেখানে এই সামান্য ঔষধ দ্বারা বিশেষ ফল হয়। জ্বালা নিবারিত হয়। তণ্ডুলোদক দ্বারা পুনঃ পুনঃ ভিজাইলে পদের জ্বালা নিবারণ হয়।

বসন্ত পাকিবার সময় হইতে শুষ্ক না হওয়া পর্য্যন্ত ধূম প্রয়োগ কর্ত্তব্য। বচ, ঘৃত, বাঁশের নীল, বাকসমূল, কাপাস বীজ, ব্রাহ্মী শাক, তুলসী, আপাং ও লাক্ষা সমভাগে লইয়া অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া রোগীর শরীরে ধূম লাগাইবে। সরল কাষ্ঠ, অগুরু ও গুগ্‌গুলু দগ্ধ করিয়া সেই ধূম রোগীর গাত্রে লাগাইলে ক্ষত বিশুদ্ধ হয়, যন্ত্রণা কমিয়া যায় এবং ক্ষতে ক্রিমি হইতে পারে না।

নিম্নলিখিত কয়েকটী পাচন বসন্ত রোগের দ্বিতীয় অবস্থা হইতে শেষ পর্য্যন্ত সেবন করা যাইতে পারে। কোন কোনটী দ্বিতীয় অবস্থায় প্রয়োগ করা চলে। খদিরাষ্টক—খদির কাষ্ঠ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, নিমপাতা, পলতা, গুলঞ্চ ও বাসক ছাল; ইহাদের ক্বাথ বসন্তরোগ নাশক।

অমৃতাদি—গুলঞ্চ, বাসকছাল, পল্‌তা, মুতা, ছাতিমছাল, খদিরকাষ্ঠ, অনন্তমূল, নিমপাতা, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা; ইহাদের ক্বাথ।

পটোলাদি—পল্‌তা, গুলঞ্চ, মুতা, বাসক-

ছাল, দুরালভা, চিরতা, নিমছাল, কট্‌কী ও ক্ষেতপাপড়া; ইহাদের কাথ পান করিলে অপক্ক বসন্ত প্রশমিত হয় এবং পক্ক বসন্ত শুষ্ক হইয়া যায়।

রক্তাশ্রয়ী বসন্ত রোগে নাসিকা, চক্ষু, মল দ্বার, ফুসফুস প্রভৃতি স্থান হইতে রক্তপাত হইয়া থাকে। দাড়িম ফুলের রস, দূর্ব্বাঘাসের রস, আম্রের কোশীর রস এবং জল বা দুগ্ধ সহ মিশ্রিত চিনি ইহাদের যে কোন একটী দ্রব্যের নাস লইলে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব নিবারিত হয়। কর্ণ বা চক্ষু দিয়া রক্তস্রাব হইলেও ঐ সকল দ্রব্যের কোন একটি প্রয়োগ উচিত। মুখ দিয়া রক্তনির্গত হইলে বাসক পাতার রস মধু ও চিনির সহিত, যজ্ঞডুম্বুরের রস মধুর সহিত, রক্তকাঞ্চন ফুল মধুর সহিত, শিমুলফুল চূর্ণ মধুর সহিত; ইহাদের যে কোন একটি যোগ প্রয়োগ করিবে। মলদ্বার দিয়া রক্তস্রাব হইলে খোসাহীন কৃষ্ণতিল বাটা আধ তোলা ও চিনি আধ তোলা ছাগদুগ্ধে মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিবে। কাঁটানটের মূল বাটিয়া চেলুনী জলের সহিত সেবন করিলেও রক্তস্রাব নিবারিত হয়। মূত্র দ্বার দিয়া রক্ত নির্গত হইলে কুশ, কাশ, শর, উলু ও ইক্ষু; ইহাদের মূলের কাথ প্রয়োগ করিবে।

যে স্থান দিয়াই রক্ত নির্গত হউক নিম্ন-লিখিত পথ্য হিতকর। কিসমিস, খেজুর, মউয়াফুল, ও ফল্‌সাফল মোট সিদ্ধ করিয়া আধ সের থাকিতে নামাইবে। অনন্তর ছাকিয়া লইয়া সেই কাথে খৈচূর্ণ ৪তোলা এবং কিঞ্চিৎ ঘৃত, মধু ও চিনি মিশ্রিত করিয়া আহার করিতে দিবে। অন্য দ্রব্য না পাইলে কেবল কিসমিস সিদ্ধ করিয়া ঐরূপ দেওয়া যাইতে পারে। প্রবল জ্বরে বা পেটের দোষ থাকিলে ঘৃত দেওয়া উচিত নহে।

প্রবল বসন্ত রোগে অনেক সময়ে বিকার উপস্থিত হয়। এই অবস্থায় সুচিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসা করান কর্ত্তব্য। এই অবস্থায় জ্বর-বিকারের চিকিৎসা করিতে হয়। রোগীর শ্বাস, কাস, পার্শ্ববেদনা, তন্দ্রাধিক্য থাকিলে দশমূল, চতুর্দ্দশাঙ্গ বা অষ্টাদশাঙ্গ পাচন এবং কস্তুরীভূষণ, কস্তুরীভৈরব, পঞ্চানন রস প্রভৃতি ঔষধ ব্যবস্থা করিবে। বুকে শ্লেষ্মা বসিয়া শ্বাসকষ্ট বা বাক্‌রোধ হইলে বক্ষঃস্থলে ও পার্শ্বে ক্রমাগত গমের ভূষির পুলটিস দিবে। চরম অবস্থায় প্রতাপলঙ্কেশ্বর, সূচিকাভরণ প্রভৃতি প্রয়োগ করা যাইতে পারে। নাড়ী ক্ষীণ এবং দেহ শীতল হইলে প্রথমে মকরধ্বজ ১ রতি, মৃগনাভি ১ রতি এবং কর্পূর ১ রতি মধু সহ মাড়িয়া ১ঘণ্টা বা অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর ৩।৪ বার খাওয়াইবে। তাহাতে কাজ না হইলে পূর্ব্বোক্ত সর্পবিষঘটিত ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

(৪) ক্ষত শুষ্ক হইতে আরম্ভ করিলে রোগীর অবস্থা বুঝিয়া শোষক পথ্য দিবে। জ্বর না থাকিলে এবং ক্ষুধা হইলে পুরাতন চাউলের অন্ন, মসুর, অড়হর ও বুটের দালের যূষ, নিমপাতা, সজিনা ডাঁটা, পটোল, পল্‌তা, উচ্ছে, কাঁচকলা, কাঁকরোল প্রভৃতি পথ্য। দুগ্ধ, মিষ্টদ্রব্য, কলায়ের দাল প্রভৃতি নিষিদ্ধ। প্রায়ই বসন্ত রোগের শেষে সর্দ্দি কাসি হয়। সর্দ্দি কিম্বা কাসি থাকিলে দুই বেলা অন্ন না দিয়া এক বেলা রুটী দিবে। রোগী অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া পড়িলে এবং অত্যন্ত বায়ু প্রকোপ থাকিলে পায়রা ও ডাক পাখীর মাংস বা জাঙ্গল মাংসের যূষ সৈন্ধব লবণ সংযোগে পথ্য দিবে।

এই সময়েও রোগীর গৃহে ধূপ দেওয়া চলিবে এবং নিমপাতা ও কাঁচা হলুদ শিলায় বাটিয়া রোগীর শরীরে প্রলেপ দিবে। যত দিন খোলস উঠিয়া না যায় ততদিন প্রলেপ দেওয়া উচিত। হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বেনার মূল, শিরীষ ছাল, মুতা, লোধছাল, শ্বেতচন্দন ও নাগকেশর জলসহ পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলেও উপকার হয়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, বসন্তরোগের শেষে অনেক সময়ে কাস হয়। কাসের জন্য নিম্নলিখিত মুষ্টিযোগের যে কোন একটী প্রয়োগ করিবে।

(১) একটি বহেড়া ঘৃতাভ্যক্ত করিয়া গোবরের ঠুলিতে পুরিয়া ঘুঁটের আগুণে পোড়াইবে। অনন্তর উহা উদ্ধৃত ও বীজ-রহিত করিয়া চূর্ণ করিবে। এই চূর্ণ মধুসহ লেহন করিলে কাস ভাল হয়।

(২) হরীতকী, শুঁঠ ও মুতা সমভাগে চূর্ণ করিয়া সমস্ত চূর্ণের সমান ইক্ষুগুড়ের সহিত মাড়িয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। এই গুড়িকা মুখে রাখিয়া চুষিয়া খাইলে কাস ও শ্বাস নষ্ট হয়।

(৩) পিপুল, শুঁঠ, খেজুর, থৈ, কিসমিস ও চিনি সমপরিমাণে একত্রে বাটিয়া এক সিকি মাত্রায় কিঞ্চিৎ মধুসহ সেবন করিলে কাস নষ্ট হয়।

(৪) পিপুল, রক্তকাষ্ঠ, লাক্ষা ও বৃহতী ফল সমভাগে চূর্ণ করিয়া দুই আনা মাত্রায় কিঞ্চিৎ ঘৃত ও মধুসহ সেবন করিলে কাস নষ্ট হয়।

বসন্তরোগের শেষে মুখে, মণিবন্ধে, কনুইয়ে এবং স্কন্ধের নিম্নে শোথ হইলে প্রথমে তাহাতে জোঁক লাগাইয়া রক্তমোক্ষণ করিবে। পরে নিম্নলিখিত যোগের কোন একটী প্রয়োগ করিবে।

(১) তিল তৈলে বিছা ভাজিয়া প্রলেপ দিলে ঐ শোথ ভাল হয়।

(২) শেওড়া গাছের ছাল কাঁজির সহিত বাটিয়া ঘৃতসংযোগে প্রলেপ দিলে শোথ নষ্ট হয়।

(৩) বট, অশ্বত্থ, যজ্ঞডুম্বুর, পাকুড় ও বেতসের ছাল বাটিয়া ঘৃতসংযোগে প্রলেপ দিলে শোথ নষ্ট হয়।

(৪) পুনর্নবা, সজিনা ছাল, দেবদারু ছাল, গাম্ভারী ছাল, বেল ছাল, শোণাছাল, পারুল ছাল, গণিয়ারী ছাল, শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর ও শুঁঠ বাটিয়া গরম করিয়া প্রলেপ দিলে শোথ ভাল হয়।*

বসন্ত রোগ ভাল হইবার পর রোগীর বল জননার্থ লঘুপাক ও পুষ্টিকর সুপথ্য দিবে। বেশ সবল না হওয়া পর্য্যন্ত সাবধানে রাখিবে। বসন্তের দাগ ও গর্ত্ত মিলাইবার জন্য শঙ্খভস্ম ডাবের জলে মাখিয়া ঘর্ষণ করিবে। কালীয় কাষ্ঠ, প্রিয়ঙ্গু, আমের আঁটির শাঁস, নাগকেশর ও মঞ্জিষ্ঠা গোময় রসে বাটিয়া ঘৃতসংযুক্ত করিয়া প্রলেপ দিলে ব্রণস্থান ত্বকের সমান-বর্ণবিশিষ্ট হয়।*

কোষ্ঠবদ্ধতা জন্মিলে বা ভালরূপ কোষ্ঠ শুদ্ধি না হইলে হরীতকী এক তোলা ও সৈন্ধব এক সিকি সেবন করিলে অথবা তেউড়ীমূল চূর্ণ তিন চার আনা ও চিনি দুই আনা মিশাইয়া গরম জল সহ পান করিলে কোষ্ঠশুদ্ধি হইয়া থাকে। প্রবল গা বমি বমি থাকিলে ব্রাহ্মী শাকের রস এক ছটাক অথবা হেলেঞ্চার রস এক ছটাক কিঞ্চিৎ মধুসহ সেবন করিয়া বমন করিবে।

* অতঃপর যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা প্রবন্ধের প্রথমে সন্নিবিষ্ট হওয়া উচিত ছিল মুদ্রাকর প্রমাদবশাৎ বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে।

লবণ মিশ্রিত গরম জল বা এক সিকি সর্ষপ চূর্ণ গরম জল সহ সেবন করিলেও বমন হয়। বমন বা বিরেচনের পরে সেইদিন কোনরূপ গুরুপাক খাদ্য আহার না করিয়া জলসাগু বা জলবার্লি খাইয়া থাকা ভাল। পরদিন শরীরের অবস্থা বুঝিয়া লঘুপাক আহার করা কর্ত্তব্য। শরীর ভারি বা ম্যাজম্যাজে হইলে অসুস্থভাব দূর হইয়া ক্ষুধার উদ্রেক না হওয়া পর্য্যন্ত লঙ্ঘন দেওয়া কর্ত্তব্য। জ্বরভাব হইলে উপবাস করা উচিত। উভয় অবস্থাতেই স্নান বন্ধ রাখা উচিত। এই সকল নিয়ম পালন করিলে বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইবার ভয় খুব কম।

চতুর্দ্দিকে বসন্ত রোগের বা যে কোন সংক্রামক রোগের প্রাবল্য ঘটিলে এবং মহামারীর সময় সেই স্থান ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাওয়া সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ।

বসন্তের প্রাবল্যের সময় জ্বর হইলে প্রথম হইতে বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত। নিবাত স্থানে অবস্থান ও উপবাস নিতান্ত প্রয়োজনীয়। বমির ভাব থাকিলে পূর্ব্বোক্ত উপায়ে বমন করা এবং কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে বিরেচক ঔষধ সেবন করা উচিত। ইহাতে রোগীর জ্বর হইলেও কখনই মারাত্মক হইতে পারে না।

শাস্ত্রোক্ত বসন্ত রোগের প্রতিষেধক কয়েকটী ঔষধ নিম্নে লিখিত হইয়াছে।

(১) নিমের বীজের শাঁস দুই আনা, বহেড়ার বীজের শাস দুই আনা ও হরিদ্রা দুই আনা পেষণ করিয়া শীতল জলসহ সেবন করিলে বসন্ত রোগ হয় না। (২) মোচার রস শ্বেতচন্দন বাটার সহিত, (৩) বাসকের রস যষ্টিমধু চূর্ণের সহিত, (৪) জাতি ফুলের পাতার রস যষ্টিমধু চূর্ণের সহিত সেবন করিলে বসন্ত রোগে আক্রান্ত করিতে পারে না।

বসন্ত রোগ যে সময়ে হয়, সেই সময়ে নিমপাতা এবং সজিনার ডাঁটা নিত্য আহার করা কর্ত্তব্য। বসন্ত রোগ পিত্তশ্লেষ্মার প্রকোপ বশতঃ হয়। আর নিমপাতা ও সজিনার ডাঁটা পিত্তশ্লেষ্মানাশক। সুতরাং বসন্ত রোগের উৎকৃষ্ট প্রতিষেধক। ইহা পরীক্ষিত।

আয়ুর্ব্বেদে মাংস ব্যবহার বিধি।

কবিরাজমহাশয় রোগীকে মাংস যূষ ব্যবস্থা করিলেন। রোগী বিস্মিত হইয়া বলিলেন, সে কি কবিরাজমহাশয়, ডাক্তারেই ত মাংসের যূষ পথ্য দেয়! আপনারা ডাক্তারদের নকল করিতেছেন দেখিতেছি! কি বিড়ম্বনা! আয়ুর্ব্বেদে যত মাংসের ব্যবহার আছে এত আর কোথায়ও নাই, অথচ লোকের এইরূপ ভ্রমাত্মক ধারণা! এই ভ্রম সংশোধন করিবার আশায় আমরা আজ পাঠকগণকে আয়ুর্ব্বেদোক্ত মাংস ব্যবহার বিধি উপহার দিতেছি।

জলচর, আনূপ (জল সমীপে বিচরণকারী), গ্রাম্য, মাংসাশী, একশফ (জোড়াক্ষুর) ও জাঙ্গলভেদে মাংস ছয়প্রকার। এই সকল মাংস উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ জলচর অপেক্ষা আনূপ, আনূপ অপেক্ষা গ্রাম্য, গ্রাম্য অপেক্ষা মাংসাশী, মাংসাশী অপেক্ষা একশফ এবং একশফ অপেক্ষা জাঙ্গল মাংস শ্রেষ্ঠ।

ইহারা আবার জাঙ্গল ও আনূপ ভেদে দুইপ্রকার। তন্মধ্যে জাঙ্গল মাংস আট প্রকার, যথা, জঙ্ঘাল, বিষ্কির, প্রতুদ, গুহাশয়, প্রসহ, বর্ণমৃগ, বিলেশয় ও গ্রাম্য। ক্রমশঃ প্রত্যেকের বিষয় কথিত হইতেছে।

জঙ্ঘাল—এণ (কৃষ্ণহরিণ), হরিণ (গৌর হরিণ), ঋষ্য (শ্বেতবর্ণপদযুক্ত হরিণ), কুরঙ্গ (ঈষৎ তাম্রবর্ণ বৃহৎ হরিণ), করাল (কস্তুরী মৃগ, ইহাদিগের নাভিতে কস্তুরী বা মৃগনাভি হয়), কৃতমাল একপ্রকার হরিণ (ইহারা দলে দলে বিচরণ করে) প্রভৃতিকে জঙ্ঘাল বলে। ইহারা বৃহৎ জঙ্ঘাবিশিষ্ট বলিয়া ঐ নামে আখ্যাত হইয়াছে। ইহাদের মাংসের সাধারণ গুণ যথা,—কষায়রসবিশিষ্ট মধুর রস, লঘুপাক, বাতপিত্তনাশক, তীক্ষ্ণবীর্য্য, তৃপ্তিকারক এবং মূত্রাশয়শোধক। অনাবশ্যক বিবেচনায় প্রত্যেকের পৃথক্ গুণ লিখিত হইল না। মূত্রাশয়শোধক বলিয়া ইহাদের মাংস অশ্মরী (পাথরী), শর্করা, মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাঘাত প্রভৃতি রোগে হিতকর।

বিষ্কির—তিত্তির, বটের, চকোর, ময়ূর, কুক্কুট প্রভৃতি পক্ষী চরণ ও চঞ্চু দ্বারা ছড়াইয়া আহার করে বলিয়া উহাদিগকে বিষ্কির বলে। ইহাদের মাংসের সাধারণ গুণ, যথা,—কষায়-রসসংযুক্ত মধুর রস, লঘুপাক, শীতবীর্য্য এবং ত্রিদোষনাশক। কুক্কুটের মাংস স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, বায়ুনাশক, শুক্রবর্দ্ধক, ঘর্ম্মজনক, স্বরপরিষ্কারক, বলবর্দ্ধক, পুষ্টিকর, গুরুপাক এবং বায়ুরোগ, ক্ষয়, বমি ও বিষমজ্বর-নাশক।

প্রতুদ—পারাবত, বন্য পারাবত, কোকিল, গ্রাম্য চটক, কাদাখোঁচা, খঞ্জন, ডাকপাখী প্রভৃতি আছড়াইয়া আহার করে বলিয়া উহাদের নাম প্রতুদ। ইহাদের মাংসের সাধারণ গুণ, যথা,—কষায় রসযুক্ত, মধুর রস, রুক্ষ, বায়ু-বর্দ্ধক, পিত্তশ্লেষ্মনাশক, মূত্ররোধক এবং মলের অল্পতাকারক। ইহাদের মধ্যে পারাবতের মাংস রক্তপিত্তনাশক, কষায় রস, মধুর বিপাক এবং গুরু। রাজনিঘণ্টুর মতে পারাবতের মাংস বলবীর্য্যবর্দ্ধক, কফ, পিত্ত ও রক্ত দোষনাশক। রাজবল্লভের মতে উহা বাতপিত্তনাশক। পারাবতমাংস সম্বন্ধে বিভিন্ন মত উদ্ধৃত করিবার কারণ এই যে, শাস্ত্রের একাংশ দেখিয়া কোন বিষয়ের বিচার করা চলে না। শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, পারাবতের মাংস সমস্ত মাংসের তুল্যগুণ-বিশিষ্ট। অন্য কোন বাদ্য না থাকিলে যেমন এক সর্ব্ববাদ্যময় ঘণ্টা দ্বারা পূজা নির্ব্বাহ হয়, সেইরূপ অন্য কোন মাংসের অভাব ঘটিলে পারাবতের মাংস দ্বারা তাহার কাজ চলে। কিছুকাল পূর্ব্বে কবিরাজেরা দুর্ব্বল রোগীর জন্য পায়রার পিলের যূষ (শাবকের) যূষ ব্যবস্থা করিতেন। এক্ষণে মুরগীর পিলে পায়রার পিলের স্থান অধিকার করিয়াছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে মুরগীর মাংস এখনও সমাজে সুপ্রচলিত হয় নাই। সুতরাং কুক্কুট-মাংস-রসে বঞ্চিত রোগীকে পায়রার পিলের যূষ দেওয়া যাইতে পারে। প্রতুদ মাংসের স্বর-বর্দ্ধক শক্তি নাই। সুতরাং সুস্বরকামী ব্যক্তির কোকিল পোড়াইয়া খাওয়া বৃথা চেষ্টা মাত্র। প্রতুদ মাংসের মধ্যে চটকের মাংস এবং ডিম্ব অত্যন্ত শুক্রবর্দ্ধক সুতরাং অল্প ও ক্ষীণশুক্র ব্যক্তিগণের পক্ষে পরম হিতকারী।

গুহাশয়—সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, নেকড়ে বাঘ, শৃগাল প্রভৃতি যে সকল জন্তু গুহায় বাস করে তাহাদিগকে গুহাশয় বলে।

ইহাদিগের মাংসের সাধারণ গুণ, যথা—মধুর রস, গুরু, স্নিগ্ধ, বলকর, বায়ুনাশক, উষ্ণবীর্য্য এবং চক্ষু ও শুক্ররোগে বিশেষ হিতকর।

প্রসহ—কাক, বাজ, পেঁচা, চিল, শিকরে, শকুন প্রভৃতি বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া ভক্ষণ করে বলিয়া ইহাদিগকে প্রসহ বলে। ইহাদের মাংস গুহাশয় প্রাণীর মাংসের ন্যায় গুণবিশিষ্ট, বিশেষতঃ ক্ষয়রোগীর পক্ষে পরম হিতকর।

পর্ণমৃগ—মলয় সর্প, গেছো ইন্দুর, কাঠবিড়ালী, বানর প্রভৃতি বৃক্ষে বাস করে বলিয়া ইহাদিগকে পর্ণমৃগ বলে। ইহাদের মাংসের সাধারণ গুণ, যথা,—মধুর রস, গুরু, শুক্রবর্দ্ধক, চক্ষুর হিতকর, ক্ষয়রোগীর হিতকর, কাস-শ্বাস-অর্শঃ-নাশক এবং মলমূত্রনিঃসারক।

বিলেশয়—শজারু, গোসাপ, বনবিড়াল-শশক (খরগোস), সর্প, ইন্দুর, বেজী (নেউল) প্রভৃতি বিলে অর্থাৎ গর্ত্তে বাস করে বলিয়া উহাদিগকে বিলেশয় বলে। ইহাদের মাংসের সাধারণ গুণ, যথা,—মলমূত্রের ঘনত্বসম্পাদক, উষ্ণবীর্য্য, মধুর বিপাক, বায়ুনাশক, শ্লেষ্মপিত্তবর্দ্ধক, স্নিগ্ধ এবং কাস, শ্বাস, ও কৃশতানাশক। ফণাযুক্ত সর্পের মাংস চক্ষুর পরম হিতকর। আশা করি, চক্ষুরোগগ্রস্ত ব্যক্তিগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন।

গ্রাম্য—অশ্ব, অশ্বতর (খচ্চর), গো, উষ্ট্র, ছাগ, মেষ এবং মেদ, পুচ্ছক (দুম্বা) প্রভৃতি গ্রামে বাস করে বলিয়া উহাদিগকে গ্রাম্য বলে। ইহাদিগের মাংসের সাধারণ গুণ যথা,—বায়ুনাশক পুষ্টিকারক, কফপিত্তবর্দ্ধক, মধুর রস, মধুর বিপাক, অগ্নিদীপক এবং বলবর্দ্ধক। তন্মধ্যে ছাগমাংস নাতিশীতল, গুরু, স্নিগ্ধ, অম্ল, পিত্ত ও কফবর্দ্ধক, অনভিষ্যন্দি এবং পীনসনাশক। বাগ্‌ভটের টীকাকার অরুণদত্ত বলিয়াছেন—ছাগমাংস মানুষের শরীরধাতুর সমান বলায় এই ভঙ্গীতে মনুষ্যমাংসের গুণ ব্যাখ্যা করা হইল। এই বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ আর্য্য জাতি নরখাদক ছিলেন বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারেন।

মেষমাংস—পুষ্টিকর, পিত্তশ্লেষ্মবর্দ্ধক, এবং গুরু। একক্ষুরবিশিষ্ট প্রাণীর মাংস মেষমাংসের সমানগুণবিশিষ্ট ও ঈষৎ-লবণরসাত্মক।

এই সমস্ত জাঙ্গল মাংস অল্প অভিষ্যন্দি। * যে সকল পশুপক্ষী লোকালয় এবং জলাশয় হইতে দূরে বিচরণ করে তাহাদের মাংস অল্প অভিষ্যন্দি। আর যে সকল পশুপক্ষী লোকালয় বা জলাশয়ের নিকটে বাস করে তাহাদিগের মাংস অত্যন্ত অভিষ্যন্দি হইয়া থাকে।

আট প্রকার জাঙ্গল মাংসের বিষয় বলা হইল। এক্ষণে আনূপ মাংসের বিষয় কথিত হইতেছে।

আনূপমাংস পাঁচ প্রকার। যথা, কূলচর, প্লব, কোশস্থ, পাদি এবং মৎস্য। ক্রমশঃ ইহাদিগের বিষয় লিখিত হইতেছে।

কূলচর—হস্তী, মহিষ, শূকর, গণ্ডার, গুন্দ (ভোঁদড়) প্রভৃতি পশু জলাশয়তীরে বিচরণ করে বলিয়া উহাদিগকে কূলচর বলে। ইহাদের মাংসের সাধারণ গুণ, যথা, বাতপিত্তনাশক, শুক্রবর্দ্ধক, মধুর রস, মধুর বিপাক, শীতবীর্য্য, বলকারক, মূত্রকারক এবং কফ-

* যে সকল দ্রব্য গুরু ও পিচ্ছিল বলিয়া রসবাহী শিরাসকলকে রুদ্ধ করিয়া শরীরের গুরুত্ব জন্মায় তাহাদিগকে অভিষ্যন্দি বলে। যেমন দধি।

বর্দ্ধক। বরাহমাংস—ঘর্ম্মকারক, পুষ্টিকর, শুক্রবর্দ্ধক, শীতবীর্য্য, ধাতুবর্দ্ধক, গুরু, স্নিগ্ধ, বায়ুনাশক এবং বলকারক। প্লব—হংস, সারস, কলহংস, বক, পানকৌড়ী প্রভৃতি পক্ষী জলে ভাসিয়া থাকে বলিয়া উহাদিগকে প্লব বলে। এই সকল পক্ষী প্রায় দলবদ্ধ হইয়া বিচরণ করে। ইহাদিগের মাংসের সাধারণ গুণ যথা, রক্তপিত্তনাশক, শীতবীর্য্য, স্নিগ্ধ, শুক্রবর্দ্ধক, বায়ুনাশক, মলমূত্রনিঃসারক, মধুর রস ও মধুর বিপাক *। তন্মধ্যে হংসের মাংস গুরুপাক, উষ্ণবীর্য্য, মধুর রস, স্বরপরিষ্কারক, বর্ণের ঔজ্জ্বল্যসম্পাদক, বল ও পুষ্টিজনক, শুক্রবর্দ্ধক এবং বায়ুনাশক।

কোশস্থ—শঙ্খ, ঝিনুক, শম্বুক ও গুগ্‌লি কড়ি প্রভৃতি যে প্রাণীর শরীর কোশের (কঠিন আবরণ) মধ্যে থাকে তাহাদিগকে কোশস্থ বলে। ইহাদের মাংসের সাধারণ গুণ যথা, মধুর রস, মধুর বিপাক, বায়ুনাশক, শীতবীর্য্য, স্নিগ্ধ, পিত্তের হিতকারক, মলনিঃসারক এবং শ্লেষ্মবর্দ্ধক।

পাদী—কচ্ছপ, কুম্ভীর, কাঁকড়া, কৃষ্ণবর্ণ কাঁকড়া, শুশুক প্রভৃতির পদ আছে বলিয়া উহাদিগকে পাদী বলে। ইহাদিগের মাংস কোশস্থ প্রাণীর মাংসের ন্যায় গুণবিশিষ্ট।

মৎস্য—মৎস্য নানা প্রকার এবং তাহাদিগের মাংসের গুণও নানা প্রকার। সাধারণতঃ নাদেয় মৎস্যে মাংসের গুণ, যথা, মধুর রস, গুরুপাক, বায়ুনাশক, রক্তপিত্তজনক, উষ্ণবীর্য্য, শুক্রবর্দ্ধক, স্নিগ্ধ এবং মলের অল্পতাকারক। পুষ্করিণী ও দীর্ঘিজাত মৎস্য মধুর রস ও স্নিগ্ধ; মহাহ্রদজাত মৎস্যসকল অত্যন্ত বলকারক এবং অল্পজলজাত মৎস্য তত বলকর নহে।

তিমি, তিমিঙ্গিল, গাগরা, চাঁদা প্রভৃতি সমুদ্রজাত মৎস্যের মাংস গুরুপাক, স্নিগ্ধ, মধুর রস; অল্পপিত্তবর্দ্ধক উষ্ণবীর্য্য, বায়ুনাশক, শুক্রবর্দ্ধক, মলনিঃসারক এবং কফবর্দ্ধক। ইহারা মাংস ভক্ষণ করে বলিয়া অত্যন্ত বলকারক। সমুদ্রজাত মৎস্য অপেক্ষা চুটী (ডোব) ও কূপজাত মৎস্য অধিকতর বায়ুনাশক বলিয়া উৎকৃষ্ট। বাপী (ক্ষুদ্র পুষ্করিণী) জাত মৎস্য সকল স্নিগ্ধ এবং মধুর রস বলিয়া পূর্ব্বোক্ত দুই প্রকার মৎস্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। নদীজাত মৎস্য মুখ ও পুচ্ছদ্বারা বিচরণ করে বলিয়া উহাদের মধ্যদেশ গুরুপাক। সরোবর ও তড়াগ (বৃহৎ পুষ্করিণী) জাত মৎস্যের মস্তক (মুড়া) লঘুপাক। বক্ষঃস্থল দ্বারা বিচরণ করে বলিয়া সরোবরজাত মৎস্যের পূর্ব্বভাগ লঘু এবং অধোভাগ গুরু। পর্ব্বতের ঝরণার মৎস্য অত্যন্তঅল্পপরিশ্রমী বলিয়া উহাদিগের মস্তকের কিয়দংশ ব্যতীত সমস্তই গুরুপাক।

আনুপ জাতীয় মাংস অত্যন্ত অভিষ্যন্দি।

চতুষ্পদ পশুর স্ত্রীজাতির মাংস এবং পক্ষীদিগের পুরুষজাতির মাংস উৎকৃষ্ট। বৃহৎকায় প্রাণীর মধ্যে যাহাদের শরীর ক্ষুদ্র এবং ক্ষুদ্রকায় প্রাণীর মধ্যে যাহাদের শরীর বৃহৎ তাহাদের মাংস উৎকৃষ্ট।

রক্ত হইতে মজ্জা পর্য্যন্ত ধাতু উত্তরোত্তর গুরু, অর্থাৎ রক্ত অপেক্ষা মাংস, মাংস অপেক্ষা মেদ, মেদ অপেক্ষা অস্থি,+ এবং অস্থি অপেক্ষা মজ্জা গুরুপাক। সক্‌থি (উরুদেশ), স্কন্ধ, ক্রোড়

* জঠরানলসংযোগে ভুক্ত দ্রব্যের যে রসান্তর ঘটে তাহাকে বিপাক বলা যায়।

+ অস্থি অর্থে সমস্ত হাড় চিবাইয়া খাইতে বলা হয়। তরুণাস্থির (Cartilaje) কথাই বলা হইয়াছে বোধ হয়।

মস্তক, পদ, হস্ত (সম্মুখের পদ), কটী, পৃষ্ঠ, বৃক্ক (Kidney), যকৃৎ (মেটে) এবং অন্ত্র উত্তরোত্তর গুরুপাক। (সক্থি অপেক্ষা স্কন্ধ, স্কন্ধ অপেক্ষা ক্রোড় ইত্যাদি। স্কন্ধ অপেক্ষা মস্তক, পৃষ্ঠ অপেক্ষা কটীদেশ এবং পশ্চাতের সক্থি (বায়) অপেক্ষা সম্মুখের সক্থি গুরুতর।

সকল প্রাণীরই দেহের মধ্যভাগ গুরুপাক। পুরুষ জাতির দেহের সম্মুখ ভাগ এবং স্ত্রী জাতির দেহের পশ্চাৎ ভাগ গুরু। বিশেষতঃ পক্ষীদিগের উরু ও গ্রীবা গুরু, এবং পক্ষ উৎক্ষেপণ হেতু উহাদের শরীরের মধ্যভাগ মধ্যম অর্থাৎ লঘুও নয় গুরুও নয়। ফলভক্ষক পক্ষীদিগের মাংস অত্যন্ত রুক্ষ, মৎস্য ভক্ষক পক্ষীদিগের মাংস অত্যন্ত পিত্তকর, এবং ধান্য ভক্ষক পক্ষীদিগের মাংস অত্যন্ত বায়ুনাশক।

জলচর, উভচর, গ্রামবাসী, মাংসাশী, একশফ, প্রসহ, বিলেশয়, প্রতুদ ও বিষ্কির ইহাদিগের মাংস উত্তরোত্তর লঘু এবং অল্প অভিষ্যন্দী। স্ব স্ব জাতির মধ্যে যে প্রাণী বৃহৎ শরীর বিশিষ্ট তাহার মাংস গুরুপাক, এবং অল্পসারবিশিষ্ট বলিয়া জানিবে। সমুদায় প্রাণীরই যকৃতের নিকটবর্ত্তী স্থানের মাংস প্রধানতম। তদভাবে মধ্যবয়স্ক, অক্লিষ্ট (যে পশু কোন ক্লেশ সহ্য করে নাই, কলিকাতায় যে সকল ছাগ চালান আইসে তাহারা খাদ্যাভাবে এবং পথশ্রমে ক্লিষ্ট হইয়া পড়ে) উপাদেয় এবং সদ্যোহত পশুর মাংস গ্রহণ করিবে।

নিষিদ্ধ মাংস—শুষ্ক বা পচা মাংস, পীড়িত বা বিষ ও সর্প দ্বারা হত পশুরমাংস, বিষাদিলিপ্ত, শস্ত্রাদিবিদ্ধ, বৃদ্ধ দুর্ব্বল, অল্পবয়স্ক এবং জঘন্যখাদ্য আহারকারী পশুর মাংস ভক্ষণ করিবে না। শুষ্কমাংস অরুচি জনক, প্রতিশ্যায় কারক ও গুরুপাক। বিষাক্ত ও ব্যাধি হত মাংস মৃত্যুজনক। অত্যন্ত কচিমাংস বমি উৎপাদক। বৃদ্ধ পশুরমাংস কাস ও শ্বাস উৎপাদক। ক্লিন্ন (পচা) মাংস উৎক্লেশ (গা বমি বমি) জনক। কৃশপশুরমাংস বায়ু প্রকোপক।

এইরূপে প্রাণীর বয়স শরীরের অবয়ব, স্বভাব, ধাতু, ক্রিয়া, লক্ষণ, সংস্কার ও মাত্রার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া মাংস সংগ্রহ ও আহার করিতে হয়। প্রত্যেকের বিষয় স্পষ্ট করিয়া বলা যাইতেছে।

বয়স যেমন মধ্য বয়স্ক প্রাণীর মাংস গ্রহণ করিবে। শরীরের অবয়ব—যেমন পক্ষীর উরুদেশ এবং গ্রীবা গুরু। স্বভাব—যেমন স্বভাবতঃ লাবমাংস লঘু। ধাতু—যেমন মাংস অপেক্ষা মেদ গুরুপাক। ক্রিয়া যেমন—বক্ষঃস্থল দ্বারা বিচরণ করে বলিয়া সরোবরজাত মৎস্যের পূর্ব্বার্দ্ধ লঘু, অল্প পরিশ্রমী বলিয়া পর্ব্বতের ঝরণার মৎস্য গুরু, যাহারা জলাশয়তীরে থাকে তাহাদের মাংস অভিষ্যন্দী এবং গুরু, যাহারা জঘন্য খাদ্য আহার করে তাহাদের মাংস অগ্রাহ্য, শষ্প শৈবাল ভোজন করে বলিয়া রোহিত মৎস্য কষায় রস, বায়ু নাশক এবং অল্প পিত্তবর্দ্ধক প্রভৃতি। লিঙ্গ—যেমন চতুষ্পদ প্রাণীর স্ত্রী জাতির মাংস উৎকৃষ্ট। প্রমাণ যেমন মহাশরীর প্রাণীদিগের মধ্যে অল্প

* এই জন্য সাহেবেরাও ছোলা খেকো (Grain fed) মাংস পছন্দ করেন।

* দেবতায় না হউক দেবতার প্রসাদ পাইয়া পাছে ভক্তদিগের বমন রোগ জন্মায় সেই ভয়ে শৃঙ্গ বাহির না হইলে ছাগশিশু দেবতার নিকট বলি দেওয়া নিষিদ্ধ হইয়াছে।

শরীর বিশিষ্ট প্রাণীরমাংস লঘু। সংস্কার—যেমন ঘৃত, দধি, ধান্যাম্ল, কলাম্ল ইত্যাদির সহিত পাক করিলে মাংস লঘুপাক হয়। পাকের ব্যাপার পরে হইবে, পাঠক ধৈর্য্যধারণ করুন। মাত্রা—যেমন গুরুদ্রব্য আধ পেটা এবং লঘুদ্রব্য পেট ভরিয়া খাইবে।

মাংসের সাধারণ গুণ আলোচনা করা হইয়াছে। এক্ষণে মাংসের সংস্কার সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

মাংস তিন শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা মৃদু মাংস, (যেমন শশকাদির মাংস,) কঠিন মাংস (যেমন হরিণাদির মাংস) এবং ঘন মাংস (যেমন অশ্বাদির মাংস) ভিন্ন ভিন্ন মাংসের পাক প্রণালীও ভিন্ন।

মাংসার্ক (মাংসের আরক)। মৃদুমাংসের অর্ক প্রস্তুত করিতে হইলে মাংসগুলিকে বড় বড় করিয়া কাটিয়া তাহাতে মাংসের চল্লিশ ভাগের একভাগ (চল্লিশ তোলা বা আধ সের মাংসে এক তোলা) সৈন্ধব লবণ মাথাইয়া এরূপ সাবধানে ধৌত করিয়া লইবে যেন মাংসগুলি অধিক সঞ্চালিত না হয়। অনন্তর জায়ফল, তেজপাত, লবঙ্গ, দারচিনি, এলাচ, নাগকেশররেণু, মরিচ ও মৃগনাভি এই সকল দ্রব্য মিলিত ভাবে মাংসের ষাট ভাগের একভাগ, ইক্ষুরস অভাবে দুগ্ধ মাংসের আট ভাগের এক ভাগ,মাংসের সহিত মিশ্রিত করিয়া মাংসের চারিগুণ জলসহ বকযন্ত্রে স্থাপিত করিবে এবং জাতী প্রভৃতি সুরভি পুষ্প দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া মৃদু অগ্নি সন্তাপে চুয়াইয়া লইবে।

কঠিন মাংসের অর্ক প্রস্তুত করিতে হইলে, মাংস ছোট ছোট করিয়া কাটিবে। অনন্তর মিলিত সৌরাষ্ট্র মৃত্তিকা ও সৈন্ধবলবণ মাংসের চল্লিশ ভাগের একভাগ পরিমাণ মিশ্রিত করিয়া তিনবার কাঁজিদ্বারা এবং সাতবার ঈষদুষ্ণ জল দ্বারা ধীরে ধীরে ধৌত করিবে, পরে পূর্ব্ব নিয়মে জায়ফল প্রভৃতি দিয়া এবং জাতী পুষ্পাদি দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া চুয়াইয়া লইবে।

ঘন মাংসের অর্ক প্রস্তুত করিতে হইলে প্রথমে মাংস খুব ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া লইবে, পরে পূর্ব্বোক্ত পরিমাণে সৈন্ধবলবণ দিয়া এবং তৎপরে শঙ্খ দ্রাবক মিশ্রিত করিয়া দুগ্ধ দ্বারা সাতবার ধৌত করিবে। অনন্তর জায়ফল প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত দ্রব্য সংযোগে চুয়াইয়া লইবে।

মাংসরস—মাংসরস তিন প্রকার—যথা ঘন, অচ্ছ এবং অচ্ছতর। তন্মধ্যে ঘন মাংস রস প্রস্তুত করিতে হইলে চারিসের জলে দেড়সের মাংস দিয়া চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। অচ্ছ মাংস রস প্রস্তুত করিতে হইলে চারিসের জলে তিনপোয়া মাংস দিয়া চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া লইবে। অচ্ছতর মাংসরস প্রস্তুত করিতে হইলে চারিসের জলে অর্দ্ধপোয়া মাংস দিয়া চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া লইবে। এস্থলে জানা আবশ্যক যে মাংস রস প্রস্তুত করিতে হইলে প্রথমে মাংস বাটিয়া বটকাকার করিবে। পরে তাহা অল্প ঘৃতে ভাজিয়া সিদ্ধ করিবে।

মাংস যুষ—মাংস একপোয়া দুইসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধসের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া গ্রহণ করিবে।

মাংস রসের গুণ যথা, সর্ব্বধাতুর পুষ্টিকর প্রাণ (Vitality) জনক, শুক্রবর্দ্ধক, ওজোবর্দ্ধক, বলবর্দ্ধক,শ্বাস কাস ও ক্ষয় নাশক,

বায়ুপিত্ত ও শ্রমনাশক, তৃপ্তি জনক, স্মৃতি, ওজঃ ও স্বরহীন ব্যক্তিদিগের পক্ষে হিতকর, অন্ন ক্ষীণ এবং উরঃক্ষত রোগীর হিতকর, যাহাদের সন্ধি ভগ্ন বা বিশ্লিষ্ট হইয়াছে তাহাদের পক্ষে উপকারী, কৃশ এবং অল্পশুক্র ব্যক্তির পক্ষে পুষ্টি ও শুক্রজনক। দাড়িমরসের সহিত প্রস্তুত মাংস রস বীর্য্যবর্দ্ধক এবং ত্রিদোষ নাশক। উদ্ধৃতসাব মাংসের গুণ—যে মাংস হইতে সাব বাহির করিয়া লওয়া হইয়াছে তাহা দুষ্পাচ্য বিষ্টম্ভী, রুক্ষ বিরস, বায়ুবর্দ্ধক এবং বল বা পুষ্টিকর নহে।

আয়ুর্ব্বেদে রোগীর পথ্যরূপে মাংস সংস্কার সম্বন্ধে এবং সুস্থ ব্যক্তির জন্য মাংস সংস্কার সম্বন্ধে সামান্য উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। অনেক স্থলে সূদ শাস্ত্রের উপর বরাত দেওয়া হইয়াছে। সূদশাস্ত্র রন্ধন কৌশল শিখিবার শাস্ত্র। দুঃখের বিষয় সূদশাস্ত্র এ পর্য্যন্ত আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই। সূদ শাস্ত্রের অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে কত প্রকার সুখাদ্য হইতে যে আমরা বঞ্চিত হইয়াছি তাহা মনে করিলে রসনা লালাস্রাব করিয়া কাঁদিতে থাকে। এক্ষণে যাহা সামান্য কিছু পাওয়া যায় পাঠক তাহা উপভোগ করুন।

ললিত মাংস—ঘৃত, দধি, কাঁজি, ফলাম্ল (দাড়িমের রস প্রভৃতি) এবং মরিচ প্রভৃতির সহিত সিদ্ধমাংস ললিতমাংসনামে পরিচিত। ইহা হিতকর, বলকর, রুচিকর, পুষ্টিকর এবং গুরুপাক।

প্রলেহ মাংস—ললিতমাংসে বেশী করিয়া ঘৃত দিয়া এবং হিঙ্গু মরিচ, জীরা, এলাচ, দারচিনি, লবঙ্গ প্রভৃতির দ্বারা সুরভি করিয়া পাক করিলে তাহা প্রলেহমাংসনামে খ্যাত হয়। ইহা পিত্ত ও কফবর্দ্ধক এবং বল মাংস ও অগ্নিবর্দ্ধক।

পরিশুষ্ক মাংস—মাংস ধুইয়া প্রচুর ঘৃতে ভাজিবে এবং তাহাতে মুহুর্মুহু উষ্ণ জল একটু একটু দিতে থাকিবে। জীরা, মরিচ, প্রভৃতি মসলা সংযোগে ঘন করিয়া এইরূপে মাংস পাক করিলে তাহাকে পরিশুষ্ক মাংস বলে। এই মাংস, স্নিগ্ধ, হর্ষজনক (রসনার এবং দেহের), ধাতু পুষ্টিকর, রুচিকর, বল, মেধা, অগ্নি, মাংস, ওজ; ও শুক্রবর্দ্ধক এবং গুরুপাক।

প্রদিগ্ধ মাংস—পরিশুষ্কমাংস প্রচুর দধি সংযোগে পাক করিলে তাহাকে প্রদিগ্ধমাংস বলে।

উল্লুপ্ত মাংস—খণ্ড খণ্ড মাংস পেষণ করিয়া ঘৃতাদির সহিত পাক করিলে তাহাকে উল্লুপ্ত মাংস বলা যায়। ইহা পরিশুষ্কমাংসের ন্যায় গুণবিশিষ্ট, ইহা অঙ্গারাগ্নিতে পাক করিতে হয় এবং সেই জন্য লঘু হইয়া থাকে।

ভর্জ্জিত মাংস—মাংস বাটিয়া মসলা মিশাইয়া ঘৃতে ভাজিয়া লইলে তাহাকে ভর্জ্জিত মাংস বলে।

প্রতপ্ত মাংস—দধি, দাড়িমের রস, ঘৃত, জীরা, লবণ ও মরিচ প্রভৃতির সহিত মাংস বাটিয়া অঙ্গারাগ্নিতে পাক করিয়া লইলে তাহাকে প্রতপ্ত মাংস বলে।

কন্দু পাচিত—মাংস, এলাচ, লবঙ্গ, হিং প্রভৃতি দ্রব্য বাটা দ্বারা লিপ্ত করিয়া কন্দুতে (over) পাক করিবে। পরে রাই সরিষা বাটা দ্বারা লিপ্ত করিবে। ইহাকে কন্দু পাচিত বলে। আজ কাল মাংস দ্বারা প্রস্তুত খাদ্য বিশেষ সরিষা বাটা (Mustard) মাখাইয়া খাইবার নিয়ম দেখা যায়। কিন্তু আয়ু-

র্ব্বেদের পাকা বন্দোবস্ত, একেবারে মাখাইয়া দেওয়া। ইহাতে সরিষা বাটা মাখাইবার বিলম্ব হইতে পরিত্রান পাওয়া যায়।

শূল্য মাংস—হিঙ্গ মিশ্রিত জল এবং এলাচি, সুগন্ধ দ্রব্য বাটা মাখাইয়া মাংস শূলে বিদ্ধ করিবে এবং নির্ধূম অঙ্গারাগ্নিতে পাক করিবে। পাক কালে একটু একটু জল বা দাড়িমাদি ফলের রস দিতে হয়। ইহাকে শূল্য মাংস বলে।

এই সকল মাংস গুরুপাক। তৈলপক মাংস উষ্ণবীর্য্য, পিত্তজনক এবং লঘু। ঘৃত পক্ক মাংস উষ্ণবীর্য্য নহে, মনোজ্ঞ এবং পিত্ত নাশক।

বেশবার—সুসিদ্ধ মাংসকে অস্থিবিহীন করিয়া শিলায় পিশিয়া লইবে। পরে পিপুল শুঁঠ, মরিচ, গুড় ও ঘৃত মিশ্রিত করিয়া পাক করিবে। ইহাকে বেশবার বলে। বেশবার গুরু, স্নিগ্ধ, বলকর, ও বাতজ রোগ নাশক। শশাঙ্ক কিরণ—মাংসের বড়া ভাজিয়া পুনরায় চূর্ণ করিবে এবং কর্পূর ও চিনি মিশ্রিত করিয়া বটকা (লাড়ু) প্রস্তুত করিবে। ইহাকে শশাঙ্ক কিরণ বলে। ইহা অত্যন্ত রুচি জনক।

এক্ষণে সুস্থ ও অসুস্থ অবস্থায় মাংসাহার সম্বন্ধে কিরূপ উপদেশ আছে তাহার আলোচনা করা যাইতেছে। প্রথমে সুস্থাবস্থার কথা ধরা যাউক।

হিতকর ও অহিতকর দ্রব্য সম্বন্ধে উপদেশ প্রসঙ্গে আয়ুর্ব্বেদে লিখিত হইয়াছে যে শালি তণ্ডুলের অন্ন, যব ও গোধূমকৃতখাদ্য, ঘৃত, জাঙ্গল মাংস প্রভৃতি নিত্য আহার করিবে। দুঃখের বিষয় যে ইচ্ছা সত্ত্বে ও এই ঘোরতর জীবন সংগ্রামের দিনে ঋষিদিগের অমূল্য উপদেশ আমরা পেট ভরিয়া পালন করিতে পারি না।

সুস্থাধিকারে বায়ু প্রধান ব্যক্তিকে গণ্ডার শূকর, মহিষ প্রভৃতি আনূপ মাংস এবং গো, অশ্ব, অশ্বতর, উষ্ট্র, গর্দ্দভ, ছাগ প্রভৃতি গ্রাম্য মাংস আহার করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। পিত্ত প্রকৃতি এবং শ্লেষ্ম প্রকৃতি ব্যক্তিকে ধন্বদেশ জাত প্রাণীর মাংস আহার করিতে বলা হইয়াছে।

ঋতু চর্য্যা প্রসঙ্গে সুস্থব্যক্তিকে গ্রীষ্মকালে জঙ্গলদেশজ মৃগ পক্ষীর মাংস যূষ, বর্ষাকালে ধন্বদেশজ মাংসের যূষ, শরৎকালে মরুভূমি জাত মৃগপক্ষীর স্বচ্ছ মাংস যূষ, হেমন্ত ও শীত, কালে আনূপ, বিলেশয়, প্রসহ গ্রাম্য এবং জলজ মাংস গরম গরম খাইবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। বসন্তকালে জাঙ্গল মাংসই ব্যবস্থা। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সকল প্রকৃতির ব্যক্তির পক্ষে এবং সকল ঋতুতেই মাংসাহারের ব্যবস্থা আছে।

পূর্ব্বকালে মাংসের যে বহুল প্রচলন ছিল, তাহা পুরাণ কাব্য আলোচনা করিলেও বুঝা যায়। রামচন্দ্র সীতার বিরহে কাতর হইয়া চতুর্দ্দিকে খুঁজিতে ছিলেন, কিন্তু স্বর্ণ গোধাটী দেখিবামাত্র বিরহ বেদনা চাপিয়া রাখিয়া গোধাটীকে সংগ্রহ করিলেন। প্রেমের দায় অপেক্ষা পেটের দায় অনেক বড়। বনবাসিনী দ্রৌপদী জয়দ্রথের অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য তাহাকে বিবিধ মাংসের লোভ দেখাইয়াছিলেন। অগস্ত্য মুনি মেষরূপী বাতাপিকে সমগ্র উদরস্থ করিয়াও কিছুমাত্র অজীর্ণ বোধ করেন নাই। সীতা শোকে কাতর জনক বৎসতরীর লোভ

সংবরণ করিলেও বশিষ্ঠপ্রাপ্ত উপহারের সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন।

মাংসের ব্যাপার লইয়া অনেক সময় বিষম দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল। পুরাণাদিতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। কোন ব্রাহ্মণ হয়ত কোন রাজার নিকট গিয়া তৎক্ষণাৎ মাংস খাইবার আবদার করিলেন, না দিতে পারিলেই বিপদ। কল্মাষপাদ গুরুকে মাংস খাওয়াইয়া নরকস্থ হইলেন ; এরূপ বহু ঘটনার পরিচয় পাওয়া যায়।

পূর্ব্বে মাংসপ্রীতি ইহলোকেই শেষ হইত না। মনুষ্যের আত্মা পরলোকেও মাংস কামনা করিত। পরলোকস্থ পিতৃপুরুষের মাংসাকাঙ্ক্ষা-নিবৃত্তির জন্য মাংসাষ্টকা শ্রাদ্ধ প্রচলিত ছিল। হায় দুর্ভাগ্য! এখন ইহ লোকেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় না, পরলোকত দূরের কথা।

এতদ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, পূর্ব্বে মাংস খাওয়া হইত। রামচন্দ্রের স্বর্ণ গোধা আহরণের বিষয় পূর্ব্বে বলিয়াছি। এক্ষণে দ্রৌপদী জয়দ্রথকে কোন কোন মাংসের লোভ দেখাইয়াছিলেন পাঠক তাহার পরিচয় গ্রহণ করুন।

"দ্রৌপদী কহিলেন, হে সৌবীর! তোমার রাজ্য, রাষ্ট্র, কোষ ও বলের কুশল ত?......। হে নৃপনন্দন! এক্ষণে পাদ্য ও আসন এবং প্রাতরাশস্বরূপ পঞ্চশত মৃগ প্রদান করিতেছি, গ্রহণ কর। আর রাজা যুধিষ্ঠির স্বয়ং তোমাকে ঐণেয়, পৃষত, ন্যঙ্কু, হরিণ, শরভ, শশ, ঋক্ষ, রুরু, শম্বর, গবয় প্রভৃতি বহু সংখ্যক মৃগ এবং বরাহ, মহিষ ও অন্যান্য মৃগ প্রদান করিবেন।"

দুঃখের বিষয় যে মাংসাহার সম্বন্ধে আমাদের উদারতা এক্ষণে বিষম হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া কেবল ছাগশিশুতে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। তবে সুখের বিষয় যে পূর্ব্বসঙ্কীর্ণতা ঘুচিয়া আবার উদারতা বৃদ্ধি পাইতেছে। হোটেলে কুক্কুট মাংসের এবং চায়ের দোকানে কুক্কুটাণ্ডের অবাধ প্রচলন ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

মাংসাহার সম্বন্ধে এত সঙ্কীর্ণতা ঘটিয়াছিল কেন এবং মাংসের প্রচলন এত কম হইয়াছিল কেন সে সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করিব। এক্ষণে আয়ুর্ব্বেদে ভিন্ন ভিন্ন রোগে মাংসব্যবহার সম্বন্ধে কিরূপ উপদেশ আছে দেখা যাউক।

জ্বরে মাংস। শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, জ্বর হইবার দশ দিন পরে রোগীর শরীরে যদি কফাধিক্য থাকে এবং সম্যক উপবাসের লক্ষণ প্রকাশ না পায় তাহা হইলে ঘৃত প্রয়োগ না করিয়া মাংসরস পথ্য দিবে। ঐণ (হরিণ) লাব প্রভৃতির মাংস রসজ্বরে সুপথ্য। কুক্কুট, ময়ূর, তিত্তির ও কৌঁচবক গুরু ও উষ্ণ বলিয়া কোন কোন চিকিৎসক জ্বরে ঐ সকল মাংসের যূষ প্রয়োগ করার প্রশংসা করেন না।

অপিচ, উপবাস হেতু জ্বররোগীর শরীরে অতিরিক্ত বায়ুপ্রকোপ ঘটিলে মাত্রা ও বিকল্পজ্ঞ চিকিৎসক কুক্কুটাদির মাংস রসও পথ্য দিবেন।

মাত্রা শব্দে পরিমাণ। কতটুকু পরিমাণে দিতে হইবে তাহার বিচার করা আবশ্যক। আর বিকল্প শব্দে বিশিষ্ট কল্পনা বা সংস্কার। কিরূপ উপায়ে এবং কি উপকরণসহ পাক করিয়া দিলে তাহা সহজে জীর্ণ হইবে এবং রোগীর পক্ষে হিতকর হইবে তাহাও বিচার করিতে হইবে। (ক্রমশঃ)

বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য।

বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য যে একেবারে নষ্ট হইতে বসিয়াছে, ইহা সুনিশ্চিত। অনেকের হৃদয়ে বল নাই, মনে স্ফূর্ত্তি নাই, কার্য্যে উৎসাহ নাই, শরীরে সামর্থ্য নাই। কর্ম্মজগতে সর্ব্বপ্রকার উন্নতির প্রয়াস-বিরহিত জীবনে অনেকেই যেন একটা অজানা স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া বিধিনিরূপিত আয়ুষ্কালের কয়টা দিন কোনরূপে কাটাইতে পারিলেই কর্ত্তব্য পালিত হইল বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। আগেকার বাঙ্গালী কিন্তু এরূপ ছিল না। খুব বেশী দিনের কথায় কাজ নাই, আমাদের এক পুরুষ পূর্ব্বেও বাঙ্গালীর অবস্থা অন্য রূপ ছিল। তখনকার বাঙ্গালী এখনকার মত সভ্যতার চরম সোপানে অধিরোহণ করে নাই সত্য; শীত, গ্রীষ্ম, শরৎ বসন্ত—সকল ঋতুতেই আবরণ-সম্ভারে সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদনপূর্ব্বক ভদ্রতার পরাকাষ্ঠা দেখাইতেন না সত্য; এক পোয়া পথ যাতায়াতের জন্যও তখনকার বাঙ্গালীরা ট্রাম অশ্বযান মোটর প্রভৃতির বন্দোবস্ত ছিল না সত্য; কিন্তু তখন তাঁহাদিগের ধমনীর ভিতর, তাঁহাদিগের শিরায় শিরায়, তাহাদিগের অস্থিতে অস্থিতে নিয়ত কালের জন্য কি যেন একটা অপূর্ব্ব শক্তি সঞ্চারিত হইত। বিধিপ্রদত্ত সেই অচিন্ত্যনীয় শক্তির সাহায্যে সে কালের বাঙ্গালী নীরোগ দেহে কালের পরমায়ু শতবর্ষ পূর্ণ না হউক, অন্ততঃ আশী নব্বই পচানব্বই বৎসর পর্য্যন্ত জীবন ধারণে সক্ষম হইতেন। এখন বাঙ্গালীহৃদয়ে সে শক্তি তিরোহিত হইয়াছে; সেই জন্য এখনকার বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যেরও এত দুর্গতি ঘটিয়াছে।

দুর্গতি বলিব না তো কি! আগেকার অপেক্ষা এখনকার বাঙ্গালীর মৃত্যুর হিসাব মিলাইলে একালে যে মৃত্যুর সংখ্যা বহুল পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহা সরকারি হিসাব দেখিলেই অবগত হইতে পারা যায়। কলিকাতা সহরে শিশুদিগের মৃত্যুর পরিমাণ প্রতিবৎসরই কিছু কিছু বর্দ্ধিত হইতেছে। শৈশব মরণের এতাদৃশ বাহুল্যের জন্য তাহাদের স্বাস্থ্যহীন পিতামাতাকেই কি কারণ নির্দ্দেশ করিলে অন্যায় হইবে? আমার তো মনে হয়, ইহা সত্যসত্যই তাহাদিগের নষ্ট স্বাস্থ্য পিতামাতার প্রায়শ্চিত্ত ভিন্ন আর কিছুই নহে।

প্রকৃত পক্ষে আমরা শক্তিহীন হইয়াছি কি না, আমাদের সামর্থ্য কমিয়াছে কিনা, অকালবার্দ্ধক্য আমাদিগের শরীরে প্রবেশ করিয়াছে কি না,—ইহার জন্য অন্য কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিতে হইবে না,—শরীর ধারণের সর্ব্বপ্রধান বিষয় আমাদের আহারের কথা আলোচনা করিলেই ইহার মীমাংসা হইয়া যাইবে। দুগ্ধ ঘৃত প্রভৃতি যে সকল আহার্য্যে আমাদিগের দেহ পুষ্ট হইবে, সে সকল দ্রব্য দেশ হইতে লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। আয়ুর্ব্বেদে দুগ্ধের নাম যতগুলি লিখিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে পয়ঃ, স্তন্য এবং বালজীবন—এ কয়টি নাম যে কেন প্রদান করা হইয়াছে, তাহা বিশেষজ্ঞের নিকট ব্যক্ত না করিলেও চলিবে। ইহার গুণব্যাখ্যায় অনেকরূপ গুণের মধ্যে ইহাকেও জীবনীশক্তিপ্রদ প্রাণিগণের আত্মা, আয়ুষ্য এবং দেহস্থ পদার্থসকলের সংশ্লেষকারক বলিয়া অভি-

হিত করা হইয়াছে। ভূমিষ্ঠ কালের পর হইতে এই পয়ঃ বা দুগ্ধ জীবনীশক্তির পোষণ কার্য্য সমাধা করিবে বলিয়া সে কালে দেশে গোপালকের ব্যবস্থা যথেষ্টরূপে প্রচলিত ছিল। সকল গৃহস্থই সেকালে নিজে গো সেবা করিতেন। ফলে গৃহপালিত গাভী-জাত দুগ্ধ বাঙ্গালী গণের নিকট সহজ প্রাপ্য-ছিল বলিয়াই বাঙ্গালী শক্তি সামর্থ্য বলবীর্য্য কান্তি পুষ্টি—তাবৎ প্রার্থনীয় বিষয়লাভেই সমর্থ হইতেন। প্রকৃত পক্ষে সেকালে বাঙ্গালী মাত্রই শরীররক্ষার জন্য দুগ্ধ পানে যেরূপ সন্তোষ লাভ করিত, সহস্র সহস্র সুবর্ণ মুদ্রার বিনিময়ও তাহার সমকক্ষ হইত না। মহাকবি ভারতচন্দ্র এইজন্যই পাটনীর মুখ দিয়া দেবীর নিকট বর প্রার্থনা করিয়া-ছিলেন,—

"আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।"

যে দেশে নীচকুলসম্ভূত সঙ্গতিহীন পাটনিও 'দুধে ভাতে' থাকিলেই তাহার অপত্যগণের যথেষ্ট কল্যাণ কামনা করা হইল বলিয়া মনে করিত, সে দেশে এক সময় দুগ্ধ-পানের ব্যবস্থা যে অত্যধিক প্রচলিত ছিল এবং সেই দুগ্ধ পানের ফলে পয়ঃ বা অমৃত পানের মত সুস্থ এবং সবলদেহে দীর্ঘজীবন লাভ ঘটিত তাহা তো বলিতে হইবে না। এক্ষণ দেশ হইতে সে ব্যবস্থা লুপ্ত হইয়াছে। বিলাতী জমাট দুগ্ধে এখন শিশুরক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। শিশুদিগের জননী—আমাদের দেশের অঙ্গনাগণ অঙ্গরক্ষার জন্য শিশুদিগকে স্তন্যদুগ্ধ প্রদানেও কার্পণ্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। এ অবস্থায় দেশে শিশুর মৃত্যুর যে যথেষ্ট কারণ নিহিত রহিয়াছে, শৈশবে মৃত্যু না ঘটিলেও স্বভাবতঃ রোগ-প্রবণ দেহ লইয়া জীবন কাটাইবার যে যথেষ্ট কারণ ঘটিয়াছে, নির্দ্দিষ্ট আয়ুষ্কালের বিপর্য্যয় ঘটিয়া অল্পায়ু হইবার যে প্রভূত কারণ দাঁড়াইয়াছে, ইহা নিভাঁজ সত্য কথা, একথার প্রতিকূলে বলিবার কেন কথাই নাই।

তাহার পর কতকটা সভ্যতার অঙ্গে গা ঢালিয়া দিয়া এবং কতকটা অক্ষমতানিবন্ধন বাঙ্গালীর আহার করিবার শক্তি সে কালের অপেক্ষা অনেক কমিয়া গিয়াছে। ভোজ নিমন্ত্রণে সে কালের মত আহার করিবার সামর্থ্য একালে বাঙ্গালীর তো লুপ্ত হইয়াছেই, যদি কাহারও সামর্থ্য থাকে তিনিও দেশ কাল বিবেচনায় লজ্জার খাতিরে সে সামর্থ্যের প্রয়োগে অনভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। সেকালে কিন্তু এমনটা ছিল না। সেকালে আহারপটু ব্যক্তির আদর সম্ভ্রম সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইত। যিনি সর্ব্বাপেক্ষা বেশী আহার করিতে পারিতেন, তাঁহাকে পরিতোষপূর্ব্বক খাওয়াইবার জন্য আয়োজনকারী ব্যস্ততায় সন্তুষ্টি লাভ করিত। এই আহার বিষয়ে পটু ব্যক্তিদিগের মধ্যে শান্তিপুর অঞ্চলের "মুন্‌কে রঘুনাথে"র নাম অদ্যাপি স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। কিম্বদন্তী আছে, এই "মুন্‌কে রঘুনাথে"র স্নানান্তে জলযোগের ব্যবস্থাই নাকি দশ পনের সের সন্দেশ বিধি-বদ্ধ ছিল।

এই আহারপটুতার ফলে শারীরিক সামর্থ্যে ঐ শান্তিপুরেরই "আশানন্দ ঢেঁকি" যেরূপ অমিত শক্তি লইয়া এক সময়ে দস্যু উপদ্রব হইতে স্বদেশ রক্ষা করিয়াছেন, তাহা-রই জন্য তাঁহার নামের জোরে "ঢেঁকি" উপাধি চলিত হইয়া আসিতেছে। প্রবাদ, সে সময়ে তাঁহার এক ধনী প্রতিবেশীর গৃহে

দস্যু আপতিত হইলে এই আশানন্দ একটি ঢেঁকির সাহায্যে তাহাদিগকে বিতাড়িত করিয়াছিলেন। তাঁহার ঢেঁকি আখ্যা তাঁহাকে সেই সময় হইতে প্রদান করা হয়।

এ সকল তো এখন গল্পকথায় পরিণত হইয়াছে। এই গল্প কথার পরিণতি ছাড়িয়া দিলেও আমাদের বাল্যজীবনে আমাদের পল্লী ভূমির ব্যসনবিরহিত ক্রিয়াপরায়ণ গৃহস্থের আঙ্গিনায় বসিয়া যখন আমরা ভোজ-নিমন্ত্রণে তৃপ্তিলাভ করিয়াছি, তখনও আমাদের মধ্যে দু'চারিজন ভোক্তার আহারপটুতায় মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারি নাই। সহরের সভ্যতার মত পল্লীপ্রান্তে পোলাও কালিয়ার ব্যবস্থা কোনকালেই ছিল না। সাদা ভাত, বিশ পঁচিশ রকম ব্যঞ্জন, প্রচুর মৎস্য, দুগ্ধের রূপান্তরে পায়স দধি ক্ষীর সন্দেশ রসগোল্লাই পল্লীগ্রামের ভোজপ্রদানে বরাবর চলিয়া আসিয়াছে। ফলাহারের ব্যবস্থা পূর্ব্বে চিঁড়া দধি-ক্ষীর-সন্দেশে নির্ব্বাহিত হইত। অধুনা লুচি তরকারি মিষ্টান্নে পরিণত হইয়াছে। যাউক সে কথা, ভোজের নিমন্ত্রণে আমাদের বাল্য জীবনে দু'চারিজন খুবই উদরপূর্ত্তি করিয়া আহার করিয়াছেন। আচমন করিয়া উঠিলেই হয়, এমন সময় তাঁহার নিকট সন্দেশ রসগোল্লা আনিয়া আরও কিছু খাই-বার জন্য অনুরোধ করা হইল, তিনি আর কিছু আহার করিলে কর্ম্মকর্ত্তার সমস্ত আয়োজন সার্থক হইবে এরূপভাব দেখান হইল, কর্ম্মকর্ত্তার সেই প্রস্তাবে সমবেত ব্যক্তিগণেরও সহানুভূতি প্রকাশ পাইল। কাজেই অনুরুদ্ধ ব্যক্তি অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিলেন না; এক গণ্ডা, দুই গণ্ডা করিতে করিতে পূর্ণ আহারের পর দশ বার গণ্ডা মোণ্ডা এবং রসগোল্লা উদরস্থ করিয়া ফেলিলেন। এখনকার দিনেও পল্লীপ্রান্তে অন্বেষণ করিলে এরূপ আহার পরায়ণ ব্যক্তি দু'দশ খানি গ্রাম ছাড়াইয়া দু'এক জন না মিলিতে পারে এমন নয়।

যাহা হউক, সেকালে বাঙ্গালীর আহার এইরূপ ছিল। জীবনধারণের জন্য, শক্তি সঞ্চয়ের জন্য, কর্ম্মঠ হইবার জন্য, আহারের ব্যবস্থা যে সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য, ইহা সেকালের বাঙ্গালী বিলক্ষণই বুঝিত। একালে পুষ্টিকর আহার্য্য পাইবারও যো নাই, পাইলেও লোক-লজ্জায় উদরস্থ করিবার উপায় নাই। এক কথায় আহারের প্রথা দেশ হইতে একরূপ উঠিয়াই গিয়াছে। এখন প্রাতে উঠিয়া খালি পেটে খানিকটা 'চা' না খাইলে চলে না। আমি এমন অনেককে দেখিয়াছি, তিনি হয়তো দিনের মধ্যে ৬।৭ বারও চা পান করিয়া আত্মতৃপ্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। ফলে এই অত্যধিক চা পান হইতে বাঙ্গালীর যকৃতের ক্রিয়া ক্রমশঃ নষ্ট হইয়া বাঙ্গালীশরীরে অজীর্ণ অগ্নিমান্দ্য অক্ষুধা প্রভৃতি নানারূপ রোগ উপস্থিত হইতেছে। কথাটা উড়াইয়া দিবার নহে; সত্য সত্য এখনকার বাঙ্গালীর বোধ হয় বার আনা আন্দাজ লোক শুধু এই কারণেই অজীর্ণপ্রবণ দেহে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন।

শুধু "চা" পান নহে, বাঙ্গালী সন্তানের দেহক্ষয়ের আরও কতকগুলি কারণ আছে। সিগারেটের ধূমপান এবং তাম্বুল বা পান চর্ব্বনের মাত্রা একালে বাঙ্গালী সন্তান যেরূপ বাড়াইয়া তুলিয়াছে, তাহারই ফলে দেশে থাইসিস বা যক্ষ্মা রোগীর সংখ্যা ক্রমশঃ পুষ্ট হইয়া উঠিতেছে। সরকারি হিসাবে শিশু-

মৃত্যুসংখ্যা বৃদ্ধির মত বর্ত্তমান সময়ে যক্ষ্মা-রোগে মৃত্যুর সংখ্যাও অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। এই অতিরিক্ত সিগারেটের ধূমপান তাহার মধ্যে যে একটী প্রধান কারণ ইহা অবিসংবাদিত।

ইহা ভিন্ন আর একটি বিশেষ কারণে বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যহানি ঘটিতেছে। সে কারণটীর কথা অনেকে গোপন করিতেছেন, কিন্তু গোপনেই সর্ব্বনাশ ঘটিতেছে। বর্ত্তমান সময় আমরা ধর্ম্মকর্ম্মের বাহিরে গিয়াছি। আমাদের দেখাদেখি আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরেরা ধর্ম্মবিগর্হিত জীবনে ব্রহ্মচর্য্য পালন একেবারে ভুলিয়া গিয়াছে। সংসর্গ দোষেই হউক বা আবহাওয়ার বশেই হউক তাহাদিগের ইন্দ্রিয় সকলের পরিপুষ্টি হইতে না হইতেই তাহারা অবৈধ উপায়ে ইন্দ্রিয় চালনায় অভ্যস্ত হইয়াছে। বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যহানির ইহাই সর্ব্বপ্রধান কারণ। এ কথাটী কেহ ভাবিতেও চেষ্টা করেন না, ইহাই দুঃখ।

রক্তের সারভাগই শুক্ররূপে পরিণত হয়। ইহা সকল দেশের সকল শাস্ত্রবিদেরাই বলিয়া গিয়াছেন। বাল্যকালে শুক্র ১২।১৩ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত জলবৎ তরল থাকে তাহার পর গাঢ়ভাব ধারণ করিতে আরম্ভ হয়। আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ঐ শুক্র অন্ততঃ ২৫ বৎসর বয়ঃক্রমের কমে কখনই পূর্ণ পরিণতি প্রাপ্ত হয় না। কিন্তু ১২।১৩ বৎসর বয়সের সময় হইতে আমাদের দেশের বালকগণ অস্বাভাবিক উপায়ে অপরিণত শুক্রক্ষয়ে অভ্যস্ত হইয়া পড়ে। ক্রমে ঐ অভ্যাস অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। তাহারই ফলে ঘুণ ধরা বংশদণ্ডের ন্যায় বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ ভরসাস্থল বালকবৃন্দের দেহ অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়িতেছে। দুঃখের বিষয় আমরা এদিকে আদৌ দৃক্‌পাত করিতেছি না। শরীরক্ষয়ের বিদ্যা তাহারা কতদূর শিক্ষা করিতেছে, তাহা আমরা একবারও ভাবিবার অবসর পাইতেছি না। কি করিয়া তাহারা কলেজের উচ্চডিগ্রি পাইয়া অর্থাগমের সুবিধা করিবে—ইহাই এখন আমাদিগের একমাত্র লক্ষ্যস্থল দাঁড়াইয়াছে।

অস্বাভাবিক উপায়ে অপরিণত শুক্রের ক্ষয় যেরূপ দোষাবহ, স্বাভাবিক উপায়েও তদপেক্ষা কম দোষাবহ নহে। এক কথায় শুক্রের পূর্ণ পরিণতি না হইলে, তাহা আদৌ ক্ষয় করা কর্ত্তব্য নহে। এইজন্য আগে বিদ্যাধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া অধিক বয়সে বিবাহ দিবার ব্যবস্থা ছিল। এখন অর্থলোভে সে ব্যবস্থা দেশের প্রায় সকল অভিভাবকই উল্টাইয়া দিয়াছেন। এখনকার বিবাহ, সাধারণতঃ পুরুষদিগের ১৮।২০ বৎসরের মধ্যে সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই ১৮।২০ বৎসরের পুরুষদিগের পত্নীগুলি আবার বয়সে তাহাদিগের দু'এক বৎসরের কমমাত্র। কাজেই ১৮।২০ বৎসরের পুরুষ পঞ্চদশী বা ষোড়শী রমণীর মিলন সুখে আপাততঃ মধুর তৃপ্তিলাভ পূর্ব্বক ভবিষ্যতে যে নিতান্ত দুর্ব্বলেন্দ্রিয় ও অকালজরাগ্রস্ত হইয়া পড়িবে ইহাতে আর বিচিত্রতা কি? কবি কি সাধ করিয়া বলিয়াছেন,—

"যৌবনে অধিক ব্যয় বয়সে কাঙ্গাল।"

অধুনা বাঙ্গালায় অম্ল, অজীর্ণ, থাইসিস্ এবং ধাতুদৌর্ব্বল্যগ্রস্ত রোগীর সংখ্যা যে এত বাড়িয়া গিয়াছে,—ঐ সকল রোগ নিবারণের জন্য প্রায় অধিকাংশ সংবাদ পত্রের বিজ্ঞাপন স্তম্ভগুলি নিত্য নূতন ঔষধে যে রোগ আরোগ্যের কীর্ত্তিকাহিনী প্রকাশ করিতেছে, তাহার কারণ ভাবিয়াছেন কি?

সেকালে লোকে ব্রহ্মচর্য্য পালনই শরীর ধারণের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা অবশ্য কর্ত্তব্য মনে করিত, উপযুক্ত সময়ে বিবাহ হইলেও তিথিনক্ষত্র বাছিয়া স্বামী স্ত্রীর মিলনের ব্যবস্থা করিত। রজঃস্বলা স্ত্রী সেকালে অশুচি জ্ঞানে গৃহস্থলীর কোন কার্য্যেই স্থান পাইত না। সেকালে এ অবস্থায় স্বামীকে এক গ্লাস জল আনিয়া দিবারও স্ত্রীর পক্ষে ক্ষমতা ছিল না। একদিকে এইরূপ ভাবে শুক্ররক্ষার যেমন ব্যবস্থা করা হইত, অপরদিকে সেইরূপ সাত্ত্বিক ও পুষ্টিকর আহার্য্যে শরীর রক্ষায় সকলেই মনোযোগ প্রদান করিতেন। কাজেই একালের অপেক্ষা সেকালের পুরুষগণ বলবীর্য্য শক্তি সামর্থ্যে চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়া ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ -সকল প্রকার সম্পদ্ লাভেই অধিকারী হইতে পারিয়াছিলেন। আয়ুর্ব্বেদ বলিয়া গিয়াছেন,—

"ধর্ম্মার্থ-কামমোক্ষাণামারোগ্যং মূলমুত্তমম্।"

যদি মানব দেহে আরোগ্যই না থাকিল, তবে তাহার ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ - এ সকল সম্পদ্ লাভ কেমন করিয়া ঘটিবে? দেশের প্রত্যেক পিতা, প্রত্যেক অভিভাবক এ সকল কথা চিন্তা করুন। চিন্তা করিয়া আগে বালক রক্ষায় যত্নবান্ হউন। তবে আবার এই অধঃপতিত বাঙ্গালী জীবনে উন্নতি হইবে। নতুবা কীটদষ্ট কুসুমের মত বাঙ্গালী জাতি যে ক্রমশঃ অধঃপতনের অধস্তন দেশে পতিত হইবে, তাহা সুনিশ্চিত।

শ্রীসত্যচরণ সেনগুপ্ত।

জ্বর।

[পূর্ব্বানুবৃত্তি।]

পুরাণে জ্বরোৎপত্তির আর একটী উপাখ্যান প্রচলিত আছে। তাহার উল্লেখ না করিলে বর্ত্তমান প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে

বাণ নামক অসুরের নাম পাঠকগণ অবশ্যই শুনিয়া থাকিবেন। বাণ শিব-বরে বলীয়ান্ ছিল, দেবগণ পর্য্যন্ত তাহাকে ভয় করিতেন। এই বাণের 'উষা' নাম্নী এক রূপসী কন্যা ছিল। সদ্যঃপ্রফুল্ল মধুগর্ভ কুসুম কলিকার ন্যায়, উষা পিতৃ গৃহে বর্দ্ধিত হইতেছিল; একদিন তাহাতে প্রেমের অরুণকিরণ প্রবেশ করিল। স্বপ্নে এক মহাপুরুষের ছায়া-মূর্ত্তি দেখিয়া, বালিকা মনে মনে তাহাকেই পতিত্বে বরণ করিল। উষা আত্মহারা হইল, পিতৃগৃহে অতুল ঐশ্বর্য্যের কোলে বসিয়াও তাহার মনে হইতে লাগিল "অতৃপ্ত-বাসনাময় নবযৌবন প্রকৃতিরই তীব্র বিদ্রূপ"। কিন্তু তাহার এই ভাব বিশ্বকাবের অপূর্ব্ব ভাষ্য রমণীর চক্ষে শীঘ্রই ধরা পড়িল। উষার সঙ্গিনী উষার বিরহ বেদনা বুঝিতে পারিল। বুঝিতে পারিল—শূন্য নয়নে জ্যোৎস্না-ফুল্ল আকাশের পানে উষার আকুল চাহনি দেখিয়া বুঝিতে পারিল—অতর্কিত আহ্বানে তরুণীর কোমল অঙ্গের অকস্মাৎ শিহরণ দেখিয়া, বুঝিতে পারিল—অনূঢ়া উষার আহারে অনিচ্ছা, ভ্রমণে অনুদ্যম, হাসিতে বিরসতা,

ও লাবণ্যে কালিমার ছায়া দেখিয়া, তখন অনেক কৌশলে, সঙ্গিনী ঊষার মনোচোরের সন্ধান করিল। শেষে, ঊষার যুগযুগান্তরের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা একটী ত্রিযামা যামিনীর মধ্যেই সাফল্য লাভ করিল! যুবতীর অনন্যাসক্ত ক্ষুব্ধ হৃদয়, লতার মত শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া, প্রেম পুলকিত দৃঢ় আলিঙ্গনে বাঞ্ছিত ধনকে বাঁধিয়া ফেলিল। যদুনাথ শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধের সহিত ঊষার গান্ধর্ব্ব বিবাহ হইয়া গেল।

কিন্তু যুবক যুবতীর এই গুপ্ত মিলন বড় বেশীদিন চাপা রহিল না। ঊষার শয্যাগৃহে অনিরুদ্ধকে দেখিতে পাইয়া, দৈত্য-প্রহরীগণ বাণ রাজাকে সংবাদ দিল। বাণের বিশালায়ত লোচনে প্রলয়াগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। পৌত্রের জীবন রক্ষার জন্য, শ্রীকৃষ্ণ সসৈন্যে বাণরাজ্য শোণিতপুরে উপস্থিত হইলেন। দানব যাদবে, মহাযুদ্ধ বাধিল। ভক্তের আহ্বানে—স্বয়ং শঙ্কর রণক্ষেত্রে আবির্ভূত হইলেন। দানব কুল, যাদব-তেজ সহিতে পারিল না, দেববিজয়ী বাণ মূর্চ্ছিত হইল। ভক্তের পরাজয়ে শঙ্কর ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। তখন, শিবের দেহ হইতে এক অপূর্ব্ব তেজঃ বহির্গত হইল। সেই তেজঃ জ্বররূপে যাদব চমূকে একেবারেই অভিভূত করিয়া ফেলিল। জ্বর শ্রীকৃষ্ণের দেহেও প্রবেশ করিল। জ্বরাবেশে ভগবানের বারম্বার পদস্খলন হইতে লাগিল, শ্বাসকৃচ্ছ্র, জৃম্ভা বিকাশ, রোমাঞ্চ, তন্দ্রা, প্রভৃতি উপসর্গে দ্বারকানাথ বড় কাতর হইয়া পড়িলেন। তখন রুদ্র-জ্বরকে সংহার করিবার জন্য, শ্রীকৃষ্ণ ও দ্বিতীয় জ্বরের সৃষ্টি করিলেন। রুদ্রজ্বর ও বিষ্ণুজ্বরে প্রবল সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। রুদ্রজ্বর পরাভব স্বীকার করিয়া বিষ্ণুর স্তব জুড়িয়া দিল। বিষ্ণু প্রসন্ন হইয়া বলিলেন "বৎস জ্বর! তোমার স্তবে আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি, এক্ষণে বর প্রার্থনা কর।" জ্বর কহিল—"দয়াময়! আমি আপনার শরণাগত হইলাম, আমার ভিক্ষা—জগতে আমি ভিন্ন যেন আর অন্য জ্বর না থাকে।" শ্রীকৃষ্ণ জ্বরের কামনা পূর্ণ করিলেন। বৈষ্ণব-জ্বর বিষ্ণু শরীরেই বিলীন হইল। তখন শ্রীকৃষ্ণ রুদ্র জ্বরকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন—"হে জ্বর! তুমি যেরূপে স্থাবর জঙ্গমাত্মক পদার্থ মধ্যে বিচরণ করিবে, আমি বলিয়া দিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া এক ভাগে চতুষ্পদ পশু মধ্যে, দ্বিতীয় ভাগে স্থাবর মধ্যে এবং অপর অংশে মনুষ্য মধ্যে বিচরণ কর। তন্মধ্যে তোমার তৃতীয় ভাগের চতুর্থাংশ পক্ষি-মধ্যে নির্দ্দিষ্ট রহিল; অপরাংশ দ্বারা মনুষ্য মধ্যে ঐকাহিক দ্ব্যাহিক ত্র্যাহিক ও চাতুর্থক নামে বিচরণ করিবে। অবশিষ্ট জাতি মধ্যে যেরূপে অবস্থান করিবে, তাহাও বলিয়া দিতেছি। তুমি বৃক্ষ মধ্যে কীট, পত্র মধ্যে পাণ্ডুতা ও সঙ্কোচ, ফল মধ্যে আতুর্য্য, পদ্মিনী মধ্যে হিম, মৃত্তিকা মধ্যে ঊষর, জল মধ্যে নীলিকা, ময়ূর দিগের মধ্যে শিখোদ্ভেদ, পর্ব্বত মধ্যে গৈরিক, এবং রোগ মধ্যে অপস্মারক ও ঘোরক নামে বিচরণ করিবে। তুমি ভূতলে, এই মত বিবিধরূপী হইবে, তোমার দৃষ্টি ও স্পর্শ মাত্র প্রাণিগণের বিনাশ ঘটিবে। দেবতা ও মনুষ্য ভিন্ন অন্য কেহ তোমার প্রভাব সহ্য করিতে সমর্থ হইবে না।"

হরিবংশ—একাশীত্যধিক শততম অধ্যায়।

[কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক অনূদিত]

ইহাই জ্বরোৎপত্তির পৌরাণিক ইতিহাস।

এই উপাখ্যানের মধ্যে যে বৈজ্ঞানিক তথ্য নিহিত আছে, ক্রমশঃ আমরা তাহার ব্যাখ্যা করিব।

পুরাণে জ্বরোৎপত্তির উপাখ্যানে মতান্তর থাকিলেও, জ্বর যে রুদ্রসম্ভব, সকল পুরাণকারই ইহা স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু শিব যে জ্বরকে সৃষ্টি করিয়াছেন, একথা, বিংশ শতাব্দীর সভ্যতাময় স্বর্ণযুগে সহসা কেহ বিশ্বাস করিবেন না। এখন, প্রত্নতত্ত্বের অনুসন্ধানে বাবুরা কিছু ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন, ফলে অনেক দেবতাই 'দেবত্ব হারাইয়া স্বাধিকার বিচ্যুত হইতেছেন। বাবুরা প্রমাণ করিতেছেন—শিব' একজন মানুষ, তাঁহার বাড়ীছিল তিব্বত দেশে। তিনি 'চামরীষণ্ডে' আরোহণ করিয়া পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরিয়া বেড়াইতেন, শীতপ্রধান দেশের অধিবাসী বলিয়া গঞ্জিকার ধূম পান করিতেন। শিব বর্ব্বরের দেবতা বর্ব্বরের সঙ্গে বাস করিতেন বলিয়া, 'দিগম্বর' সাজিতেন, কখনও বা কটিদেশে বাঘছাল আঁটিয়া লজ্জা নিবারণ করিতেন। শিব যখন, মাংসাশী, উলঙ্গ, ভিখারী, শ্মশানবাসী, তখন নিশ্চয়ই অনার্য্য। হিন্দুরা জোর করিয়া শিবকে দেবতা করিয়া ঘরে তুলিয়াছেন।

অনুচিকীর্ষু'র দল এই ভাবে শিবের স্বরূপ নির্ণয় করিতেছেন। এ যেন পাদরীর মুখের কুৎসার প্রতিধ্বনি! এই সকল উৎকট মতের বিরুদ্ধে আমাদের বলিবার কিছু নাই। তবে জ্বরের কথা লিখিতে গেলে শিবকে ছাড়া চলেনা। জ্বরের প্রকৃতি বুঝিতে হইলে শিবকে চিনিতে হইবে, শিব-সর্ব্বস্ব তন্ত্রের গূঢ় রহস্য জানিতে হইবে। সেই জন্যই শিবের কথায় উল্লেখ করিলাম।

হিন্দুর দেব দেবীর ধ্যান, মূর্ত্তিকল্পনা, রূপের আরোপ, বর্ণের দ্যোতনা—সমস্তই ভাবের সাবয়ব বিকাশ মাত্র। হিন্দু জানিতেন তাঁহার চিন্ময়ী দেবতা, মৃন্ময়ী হইলেও মৃত্তিকা-নির্ম্মিত প্রতিমা দেবতা নহেন, তাই পূজান্তে হিন্দু মাটির ঠাকুরকে বিসর্জ্জন দিয়া থাকেন।

শিব—সৃষ্টির পুংশক্তি। এ শক্তি আদি ও অন্তে স্থায়ী, ইহার বিশেষণ—সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বভূতান্তরাত্মা, মহাকাল; শিব, সংহার মূর্ত্তি, নিখিল শক্তি তাহাতেই সংহৃত হইয়া থাকে। সৃষ্টির সংহরণ—শিবেরই অভিব্যঞ্জনা, তাই শিবেরনাম মৃত্যুঞ্জয়। মৃত্যুর অজ্ঞেয়তায় তাঁহার কণ্ঠ নীলবর্ণ; বিনাশ-শক্তি বিষধর তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। যে শ্মশানে জীবের পরিসমাপ্তি, শিব সেই স্থানে বাস করেন। ব্রহ্মাণ্ডের পরিণতি—ভস্ম শিবের অঙ্গরাগ। মনুষ্য-জীবন শিবত্ব স্ফুরণের মহামুহূর্ত্ত. শারীর বিদ্যায় মেরুদণ্ড—বিল্ববৃক্ষ। আমাদের দেহতত্ত্বের অনেক রহস্যই গল্পাকারে রচিত, সেই সকল গল্প, অর্থবাদ ও রূপক রোচকের ভিতর দিয়া, তন্ত্রে বেদে, পুরাণে—ত্রিষ্টুভ, অনুষ্টুভ, জগতী মহতীব মধুচ্ছন্দে কাল সাগরে প্রবাহিত।

পৌরাণিক তত্ত্বের অর্থ—

শারীর ক্ষেত্রে—শিব পিতৃ অংশ [Katabolism] বা দৈহিক বৈশ্লেষিক শক্তি। জ্বর চিকিৎসার রস প্রয়োগের সময় বিস্তারিত ভাবে ইহা বুঝাইবার চেষ্টা করিব। তন্ত্রে শ্লেষ্মার নাম 'শিব'—শ্লেষ্মা বা শারীরনিস্রাব [ঘর্ম্ম, মল, মূত্রাদি]—এই বৈশ্লেষিক শক্তির ফল। মহর্ষি অগ্নিবেশ জ্বরকে দেহ ও মনের সন্তাপ বলিয়াছেন। দেহ ও মনের যে সমবায় তাহারই

নাম পুরুষ, সুতরাং জ্বর পুরুষের [ভিতরকার মানুষের] এক প্রকার সন্তাপ। দক্ষ—দেবীর পিতা, মাতৃ অংশের [Anabolism রসপাক] প্রসবিতা। অতএব দক্ষ, বা শরীরের রসপাক প্রবর্ত্তক কারণ, যদি তাঁহার কন্যার [রসপাকের] সহায়তা না করেন; যদি তিনি শিব বা শরীরের বৈশ্লেষিক অর্থাৎ প্রাসেকিক ক্রিয়ার ন্যায্য প্রাপ্য উপহারাদি না দিয়া তাহার অপমান করেন, তাহা হইলে শিব [দৈহিক স্রাব ক্রিয়া—মলমূত্র ঘর্ম্মাদি] কুপিত হইয়া যে উত্তাপ উৎপাদন করেন, তাহারই নাম জ্বর। আপনারা জ্বরের নিদানের সহিত এ সকল তত্ত্ব মিলাইয়া লউন; দেখিবেন জ্বরের নিদান ইহা ভিন্ন আর কিছুই নহে। শরীরের স্রাব সংরোধ বা রসপাকের ব্যাপন্ন অবস্থাই জ্বরের মূল ভিত্তি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি - অথর্ব্ব বেদে এক রকম রোগের উল্লেখ আছে, তাহার নাম "তক্মণ"। এই 'তক্মণ' রোগই বৌদ্ধযুগে 'জ্বর' সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই স্থলে আমরা বৌদ্ধযুগের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস কীর্ত্তন করিব।

দিনকরের যেমন উদয়াস্ত আছে, তেমনি যুগধর্ম্মের ও উদয়াস্ত আছে। কালক্রমে, তীক্ষ্ণশায়কের মত উজ্জ্বল ব্রাহ্মণ্য প্রতিভাও নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছিল। যজ্ঞের ছল করিয়া ভারতে তখন রক্তের স্রোতঃ প্রবাহিত, যজ্ঞভূমি যুদ্ধ-ভূমির আকৃতি ধারণ করিয়াছিল। রক্ত-লিপ্ত বৈদিক ধর্ম্ম, ক্রমে সংকীর্ণ সংহিতায় পরিণত হইয়াছিল। সোম-পানের পরিবর্ত্তে ভারতের আবাল বৃদ্ধ বনিতা সীধু-পান আরম্ভ করিয়াছিল। উপনিষদের সূক্ষ্ম হেতুবাদ বুঝিবার লোক বিরল হইয়া আসিতেছিল। ঋষিরা সেই সকল তত্ত্বে রক্ত মাংসের সংযোগ করিয়া পুরাণ রচনায় মন দিয়াছিলেন। এই রূপ সময়েই, ভারতের এক মঙ্গল মুহূর্ত্তে—কপিলবাস্তুর রত্নপ্রাসাদে ভগবান্ বুদ্ধদেব জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। বুদ্ধ প্রসারিত ধর্ম্ম সঙ্কীর্ণ ব্রাহ্মণ্যের বিরুদ্ধে রীতিমত যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিল। নূতন ধর্ম্ম, জগতে ও জীবনে নূতন প্রাণ ঢালিয়া দেয়। বৌদ্ধধর্ম্মও ভারতকে নূতন ভাবে গঠন করিয়াছিল। বৌদ্ধযুগে একদিকে আয়ুর্ব্বেদের অধঃপতন ঘটিয়াছিল। রাজাজ্ঞায় পশুবলি, শবচ্ছেদ প্রভৃতি বন্ধ হইয়া গিয়াছিল. শারীর তন্ত্রের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছিল; অন্য দিকে আবার চিকিৎসা বিজ্ঞান কর্ম্মাভ্যাসের মহিমায় জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছিল! "প্রিয়দর্শী" রাজা অশোক, মানুষ ও পশু উভয় সম্প্রদায়ের জন্যই 'রুগ্ণাবাস' ও 'চিকিৎসালয়' স্থাপন করিয়াছিলেন। বেদে দেবতা—মানুষ; বৌদ্ধ ধর্ম্মে মানুষ—দেবতা; এই 'দেবত্ব' ও ভ্রাতৃতন্ত্রের মিলন সংবাদ লইয়া, শ্রাবকেরা দেশে দেশে ছুটিয়া ছিলেন। অনাম কামবোধির কূল হইতে গ্রীক দ্বীপপুঞ্জ পর্য্যন্ত নির্ব্বাণ মন্ত্রের ঐক্যতানে মুখর হইয়া উঠিয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্ম জ্বালা যন্ত্রণা নিভাইবার ধর্ম্ম। কারুণ্যে—আয়ুর্ব্বেদের জন্ম, প্রসার ও পরিপুষ্টি বলিয়া বৌদ্ধগণ আয়ুর্ব্বেদকে আদরে বরণ করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ নৃপতি ভিক্ষু শ্রাবকের সহিত বৈদ্যকেও গ্রহণ করিয়াছিলেন। আয়ুর্ব্বেদের অনেক সংহিতায় বৌদ্ধ প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধ নাগার্জ্জুনের হস্তে 'সুশ্রুত' প্রতি সংস্কৃত হইয়াছিল। আমাদের বিশ্বাস এই বৌদ্ধ যুগেই "জ্বর" নামে, বৈদিক "তক্মণের" নাম-করণ হয়।

এ অনুমানের কারণ—বেদে 'জ্বরের'

নুযর নাই, আচার্য্যযুগের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ সুশ্রুতের সূত্র বা নিদান স্থানে জ্বরের উল্লেখ নাই। সুশ্রুতের উত্তর তন্ত্র (যাহা নাগার্জ্জুনের রচনা বলিয়া প্রসিদ্ধ) সেই উত্তর তন্ত্রেই জ্বর প্রসঙ্গ লিখিত হইয়াছে। সুশ্রুতাবির্ভাবের বহুকাল পরে এই উত্তর তন্ত্র মূল সংহিতার সহিত সংযোজিত হইয়াছে।*

প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ রাজা অশোক ব্রাহ্মণ বিরোধী ছিলেন। তাঁহার শাসন সময়ে তিনি যে ব্রাহ্মণদিগের ক্ষমতা নষ্ট করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাহার প্রচুর প্রমাণ সাহিত্য জগতে প্রচার করিয়াছেন। বৌদ্ধযুগে ব্রাহ্মণ রচিত 'আয়ুর্ব্বেদেরও' অনেক পরিবর্ত্তন করিয়াছিল। কেবল দৈহিক ব্যাধি বিনাশ বৌদ্ধধর্ম্মের 'প্রণব' বলিয়া বৌদ্ধগণ 'আয়ুর্ব্বেদকে' নষ্ট করিতে পারেন নাই। বরং তাহারা 'আয়ুর্ব্বেদকে" ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতন করিয়া গড়িয়া আপনাদের প্রয়োজন সিদ্ধির অনুকূল করিয়া লইয়াছিলেন।

তাহার পর বৌদ্ধযুগের অবসান, তান্ত্রিক যুগের আবির্ভাব। সংঘ সত্যভ্রষ্ট হইয়া টলিতেছিল, নির্ব্বাণের দার্শনিকতা ভুলিয়া, অপাত্র ন্যস্ত ব্রহ্মচর্য্য উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িতেছিল। মঠ চৈত্যে ব্যভিচার আসিয়া অনার্য্য উৎসবে যোগদান করিতেছিল। শঙ্কর, রামানুজ ও উদয়নের প্রতিভা উদয় তোরণে উঁকি মারিতেছিল। সুযোগ বুঝিয়া ব্রাহ্মণ্য আবার স্ব-প্রতিষ্ঠার অবসর খুঁজিতেছিল।

ভারতে আবার ধর্ম্ম-বিপ্লব আরম্ভ হইল। বৌদ্ধ ধর্ম্ম বলিয়াছিল—"রমণী ত্যাগ কর," তন্ত্র ঘোষণা করিলেন—রমণীত্ব জননীত্বে পরিণত কর। তাহা হইলেই তোমার প্রাকৃতিক পিপাসার শান্তি হইবে।"

এই সময় সামবেদী শুদ্ধ গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ সগৌরবে মাথা তুলিলেন। পাটলিপুত্র নগরে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইল। ব্রাহ্মণ বৌদ্ধের উপর প্রতিশোধ লইলেন। বজ্র-দীর্ণ গিরিশৃঙ্গের ন্যায় অশোকের বিশাল রাজ্য চূর্ণ বেণু হইয়া মহাশূন্যে মিশিয়া গেল। এ ঘটনা খৃঃ পূঃ ২৪৯ হইতে খৃঃ ৭৫০ পর্য্যন্ত এসিয়ার ইতিহাসে অক্ষরে অক্ষরে অঙ্কিত আছে, অনুসন্ধিৎসু পাঠক পড়িয়া দেখিবেন। স্বল্পাবসরে মাসিকের ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহা বলিবার নহে।

ব্রাহ্মণ পুষ্যমিত্র রাজা হইলেন; অশোক ব্রাহ্মণ-বিরোধী ও বেদ-বিদ্বেষ্টা ছিলেন, অশোকের দলের উপরই পুষ্যমিত্রের প্রদীপ্ত রোষানল বজ্রের ন্যায় পতিত হইল। 'স্থবিরবাদী' "মহাসাঙ্ঘিক" প্রত্যেক বৌদ্ধই পুষ্যমিত্রের নির্য্যাতন সহিতে লাগিল। আয়ুর্ব্বেদের উপর দিয়াও এই বিপ্লবের ঝড় বহিয়া গেল। রুগ্বিনিশ্চয় তন্ত্রে, আবার বৈদিক যুগের 'তক্মণ' রোগ বিপর্য্যস্ত প্রকৃতির আর্ত্তস্বর শুনাইয়া দিল। বাগ্‌ভটের শিষ্য মিশ্রকেশ 'তক্মণে'র লক্ষণ আবার লিপিবদ্ধ করিলেন,—

---

* রায় মহাশয়ের অবগতির জন্য নিবেদন করিতেছি যে, সুশ্রুতের সূত্রস্থানের ৩য় অধ্যায়ের সূচীতে জ্বরের উল্লেখ আছে। ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে জনপদ ধ্বংসকারী জ্বরের, ১০ম অধ্যায়ে স্পর্শেন্দ্রিয় দ্বারা জ্বরের উত্তাপ পরীক্ষা, ১১ অধ্যায়ে পানীয় ক্ষারের জ্বরে অহিতকারিতা, ২১ অধ্যায়ে সর্ব্বাঙ্গগত রোগের উদাহরণে জ্বর এবং ৩৩ অধ্যায়ের ১৩—১৮ শ্লোকে জ্বরের অসাধ্য লক্ষণ আছে। আরও আছে। সুশ্রুতের উত্তরতন্ত্র যে নাগার্জ্জুনের রচিত বা পরে সংযোজিত নহে একথা বনৌষধিদর্পণের ভূমিকার "বৈদ্যক গ্রন্থের বিবরণে" বলা হইয়াছে।

আঃ সং।

কম্পঃ কণ্ঠৌষ্ঠবিট্‌শোষাক্ষবো মূর্দ্ধোদরাঙ্গরুক্‌।
বৈষম্যাস্বপ্নসন্তাপজৃম্ভাশ্চ তক্মাকৃতিঃ॥ "

কম্প, কণ্ঠ ও ওষ্ঠ শোষ, মলশোষ [মলরুদ্ধতা] হাঁচী বন্ধ, উদরের ঊর্দ্ধদিকে এবং মস্তকে যন্ত্রণা, বিষমবেগ, অনিদ্রা এবং শরীরের সন্তাপ ও জৃম্ভা—তক্মণ রোগের এই গুলি লক্ষণ। আবার তক্মণের পূর্ব্বরূপ দেখুন ;—

"জৃম্ভাঙ্গমর্দ্দাবরতি দৃ'গ্‌দাহো গৌরবারুচী।
তক্মণানাং প্রাগ্‌রূপং হি দ্বিত্রিজে দ্বিত্রিলক্ষণম্‌।

তক্মণই যে জ্বর, ইহাতে আর সন্দেহ থাকে কি ? তান্ত্রিক যুগের প্রথমপাদে পুষ্যমিত্রের শাসনকালে যে সকল আয়ুর্ব্বেদ তন্ত্র রচিত হইয়াছিল, মিশ্রকেশের 'আময়াবলোক' তাহাদের অন্যতম। আমাদের বিশ্বাস বৈদিক যুগে যে রোগ তক্মণ নামে পরিচিত ছিল, বৌদ্ধ যুগের বৈদ্যগণ তাহাকেই "জ্বর" আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। আবার বৌদ্ধ বিদ্বেষের ফলে তান্ত্রিক যুগে সেই জ্বর "তক্মণ" নামে পুনরভিহিত হইয়াছিল। তাহার পর, বৌদ্ধ ধর্ম্মের উপচার যখন তান্ত্রিকতায় মিশিয়া গেল, লোকে যখন অসাম্প্রদায়িক ভাবে সত্যের আদর করিতে শিখিল, তখন তক্মণ ও জ্বর হরিহরের মত এক হইয়া গেল। জ্বর নামেই তাহা আয়ুর্ব্বেদ সংহিতায় স্থান লাভ করিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীব্রজবল্লভ রায়।

আয়ুর্ব্বেদের জয়।

তখন কাটোয়ায় থাকিতাম।

কাটোয়া বর্দ্ধমান জেলার মধ্যে একটী অতি প্রাচীন স্থান। ইহার পৌরাণিক নাম —'কণ্টকদ্বীপ', ঐতিহাসিক এরিয়ান সাহেব 'কণ্টকদ্বীপের' অপভ্রংশে Katadupa নামে ইহার নামকরণ করেন। সেই 'কাটাদুপা' ক্রমে কাটোয়ায় দাঁড়াইয়াছে। সেন রাজের সময়ে, মুসলমানের আমলে, কাঁটোয়া বাণিজ্য বন্দররূপে পরিণত হইয়াছিল। বিশেষতঃ "নদীয়া বিজয়ের" পর ইহার ঐশ্বর্য্য ও সৌন্দর্য্যের সীমা ছিল না। গঙ্গা ও অজয়ের সঙ্গমে অবস্থিত বলিয়া মুসলমানগণ এই কাঁটোয়ায় কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছিলেন।

কাঁটোয়ার পূর্ব্ব সমৃদ্ধি এখন আর কিছুই নাই। কালের ইঙ্গিতে সমস্তই সলিল-সমাধি লাভ করিয়াছে। তবে জেলায় মহকুমা থাকায় সহর এখনও একেবারে শ্রীহীন হইয়া পড়ে নাই। চাউলের গঞ্জ, এবং ন্যায়পরায়ণ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের কাছারী, এখনও সহরকে জীবন্ত রাখিয়াছে।

আমি থাকিতাম নগরের বাহিরে। বিস্তৃত মাঠের মধ্যে একটী সুন্দর বাংলায় আমি বাস করিতাম। সংসারে আমার স্ত্রী ও আমি, আর দ্বিতীয় কেহ ছিল না। এই দুইটী প্রাণীর পরিচর্য্যার জন্য দুইজন ভৃত্য, দুইজন দাসী এবং এক অলকাতিলক শোত্রী উৎকল ব্রাহ্মণ, পাচকরূপে আমাদের ঘর আলো করিয়াছিলেন।

আহারের পর আমি কর্ম্মক্ষেত্রে যাত্রা করিতাম। আমার স্ত্রী তখন একা। সময় কাটাইবার জন্য আমাদের অবস্থান স্থানের সৌষ্ঠববর্দ্ধনে তিনি কিছু অতিরিক্ত মনঃসংযোগ করিয়াছিলেন। চাকর চাকরাণীদের তিনি বসিয়া থাকিতে দিতেন না, নিজেও নজের

পাঠে অবসর সুখ ভোগ করিতেন না। বাড়ী ঘর সাজানো বাংলোটিকে তিনি বেশ সাহেবী ধরণে সাজাইয়া ছিলেন। শিক্ষিতা মহিলার কলা-নিপুণ হস্তে, আমার বাংলো এক অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিয়াছিল। বন্ধু বান্ধব যিনিই বেড়াইতে আসিতেন, তিনিই আমাদের বাংলো দেখিয়া, আমার স্ত্রীর রুচির প্রশংসা করিতেন। মেদী পাতার বেড়ার মাঝখানে একটী ক্ষুদ্র গেট, গেটের পরেই রক্ত কঙ্করাবৃত সঙ্কীর্ণ পথ বাংলোর সোপান পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ। সেই পথের দুই পার্শ্বে সারি সারি ক্রোটন গাছ, ক্রোটন সারির পশ্চাতে---সমতল ভূমি-খণ্ডের উপর নানাবিধ ফুলের গাছ। গাছ-গুলিতে বারমাসই ফুলফুটিত। আব এই বাগান ঘেরা বাংলো খানির সরল সজ্জা কৌশল, দর্শকগণকে দুইখানি বলয়-মণ্ডিত কল্যাণ ভরা কোমল হস্তের সন্ধান বলিয়া দিত।

একদিন অপরাহ্নে কর্ম্ম ক্লান্ত দেহে বাসায় ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম—শিশুর চপলহাস্তে ক্রীড়া কোলাহলে নির্জ্জন বাংলো যেন আনন্দ-মুখর হইয়া উঠিয়াছে। অল্পক্ষণ পরেই বুঝি-লাম—আমার এক শ্যালিকাপতি সপুত্র স-কলত্র আমাদের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছেন। বাসায় একটা ধুম লাগিয়া গিয়াছে, দাস দাসীরা ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে।

কথা প্রসঙ্গে জানিতে পারিলাম, আমার শ্যালিকাটী কিছুদিন আমার বাংলোর অতিথি রূপে কাটোয়ায় বাস করিবেন। তিনি ম্যালেরিয়া জ্বরে অনেক দিন ভুগিতেছেন, ডাক্তার স্থান পরিবর্ত্তনের পরামর্শ দিয়াছেন। বিদেশে পরিচিত বা আত্মীয় লোক না থাকায়, আমার শ্যালিকাপতি তাঁহার পত্নীকে কিছুদিন আমাদের আশ্রয়েই রাখিবার সঙ্কল্প করিয়া-ছেন।

আমার শ্যালিকা-পতিটী—চৌকীদারের সর্দ্দার, অর্থাৎ ডেপুটী বাবু—দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্ষমতা প্রাপ্ত হাকিম। সুতরাং তাঁহার প্রস্তাব আমি সাগ্রহেই অনুমোদন করিলাম। ২।৩ দিন পরেই ডেপুটী বাবু কর্ম্মস্থলে চলিয়া গেলেন। শ্যালিকা আমাদের কাছেই রহিলেন।

এস্থলে আমার শ্যালিকার একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিব। আমার শ্যালিকা আমার স্ত্রীর দুই বৎসরের অগ্রজ। প্রথমা কন্যা বলিয়া তিনি পিতামাতার স্নেহের পাত্রী ছিলেন; সুতরাং জনকালয়ে গৃহস্থলীর কাজ শিখিবার তাঁহার অবসরই হয় নাই। তাহার পর, বিবাহের পরই তিনি ডেপুটীগৃহিণী। ইহ জীবনে এই ডেপুটীগৃহিণীর যে কয়টী বিশেষ কর্ম্ম ছিল, তাহার মধ্যে—

১। বেলা ৯টার সময় শয্যাত্যাগ।

২। শয্যাত্যাগ করিয়া চা পান

৩। বেলা ১১ টার মধ্যে আহার।

৪। আহারান্তে ছয় ঘণ্টা ব্যাপী সুদীর্ঘ নিদ্রা।

৫। সর্ব্বদাই সিলুকা-জ্যাকেট, বডিস্ প্রভৃতি আঁটিয়া বসিয়া থাকা।

৬। দাস দাসীর প্রতি কারণে অকারণে তিরস্কার। এইগুলিই প্রধান।

তাঁহার দেহ ভাল ছিল না। হিষ্টিরিয়া ও ডিস্‌পেপ্‌সিয়া তাঁহার চিরসঙ্গিনী ছিল। ইহার উপর প্রায় বর্ষাকাল ধরিয়া তিনি ম্যালেরিয়ায় ভুগিতেছেন। শ্রম-বিমুখ শরীর যে ব্যাধির মন্দির, এই ডেপুটি গৃহিণীই

তাহার একমাত্র উদাহরণ। ডেপুটী বাবু পত্নীকে চালচলনে বিবি বানাইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি বুঝিতে পারেন নাই,—ইংরাজ মহিলা-রাও আবশ্যক মত ব্যায়াম করিয়া থাকেন। অশ্বারোহণে টেনিস্ ক্রীড়ায় তাঁহাদের যে অঙ্গ সঞ্চালন কার্য্য সম্পন্ন হয়, তাহাতেই তাঁহাদের কুসুম-কোমল কলেবর স্বাস্থ্যের অরুণিমায় ঝলমল করিতে থাকে। বাঙ্গালী বাবুরা ইহা বুঝিতে পারেন না ; তাঁহারা পত্নীকে বিবি সাজাইয়া কেবল গৃহ শোভার উপাদানে পরি-ণত করেন। তাই এখনকার বঙ্গনারী—

"নামটী অবলা কিন্তু ছলনায় ছাঁদুনী।
অগ্নি তাপে গলে তনু ভাত রাঁধে রাঁধুনী॥
গৃহকার্য্যে শক্তি নাই লোকে বলে গৃহিণী।
ধাত্রী পালে শিশু ছেলে, তবু হয় "জননী"॥
সৃষ্টি ছাড়া দৃষ্টি পোড়া হিষ্টিরিয়া সঙ্গিনী।
দাস দাসীদের প্রতি মুহুঃ চোখ রাঙ্গানী॥

ইত্যাদি কবি কাহিনীর লক্ষ্যস্থল হইয়া পড়িতে-ছেন। বিলাসিতায় আমাদের "সদর অন্দর" কলুষিত হইতে বসিয়াছে।

ডেপুটী বাবু যে কেবল পত্নীকেই বিবি বানাইয়া সন্তুষ্ট ছিলেন, তাহা নহে। পুত্র কন্যাকে নীতি শিক্ষা দিবার সময় ও তিনি হিন্দু আদর্শ ভুলিয়া যাইতেন। আত্মত্যাগের মহিমা বুঝাইবার জন্য তিনি জনহাওয়ার্ডের দৃষ্টান্ত দিতেন। সন্তানকে হিতাহিত জ্ঞান বুঝাইবার জন্য থিওডোর পার্কারের উপাখ্যান কীর্ত্তন করিতেন, নেপোলিয়নের উদাহরণ দিয়া তাহাদের বীরত্ব বুঝাইতেন। অথচ তাঁহারই দেশে বীরত্ব ধীরত্ব উদারতা' ও সহিষ্ণুতার আদর্শ স্বরূপ কত ভীষ্ম, কর্ণ, রাম ও কৃষ্ণ — প্রভৃতির চরিত কাহিনীর কখনও অপ্রতুল ছিল না। কিন্তু ব্যর্থ শাসন বাল্য পঙ্কিলতা হইতে তাঁহার পুত্রেরা কখনও পরিত্রাণ পাইত না। তাহারা নিরাকার সত্যস্বরূপ পরব্রহ্মকে যতটা না বিশ্বাস করিত, তাহার চেয়েও বিশ্বাস করিত, পিতামহী মুখশ্রুত বিকট-নেত্রা জটাই বুড়ীকে নেল্‌সনের দৃষ্টান্ত খাড়া করিয়া, সন্ধ্যাকালে তিনি যে পুত্রকে নির্ভীকতার মাহাত্ম্য শিখাইতেন, পরদিন প্রভাতে একটী নিরীহ গঙ্গা ফড়িং দেখিয়া তাহার সেই পুত্রই ভয়ে মূর্চ্ছিত হইত।

যাহা হইক, ডেপুটী গৃহিণী আমাদের কাছে দুই মাস থাকিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার স্বাস্থ্যের কোন উন্নতি দেখা গেলনা। এমন ছায়ালোক উদ্ভাসিত মধুরানিল বীজিত সুন্দর স্থানে বাস করিয়াও তাঁহার রোগের উপশম হইল না। তখন সকলেই বলিলেন — একবার কলিকাতায় গিয়া ভাল ডাক্তার দেখান উচিত। ৫।৬ দিনের মধ্যেই সেই ব্যবস্থা করা হইল। ডেপুটী বাবু ছুটী লইলেন। কলিকাতায় একটা বাসা স্থির করা গেল। একজন ভাল ডাক্তার ডাকা হইল—তাঁহার ফিঃ ষোড়শ মুদ্রা। তিনি মোটরে চড়িয়া আসিলেন, রোগিণীকে অনেকক্ষণ ধরিয়া পরীক্ষা করিলেন, শেষে অতুল গাম্ভীর্য্যের সহিত মন্তব্য প্রকাশ করিলেন—"রোগিণীর থাইসিস্ হইয়াছে, তবে প্রথম অবস্থা, ভাল হইতে পারে।"

রোগের নাম শুনিয়াই আমরা ভীত হই-লাম। যাহা হউক, ডাক্তারের ব্যবস্থা মত ঔষধ সেবন চলিতে লাগিল। একমাস কাটিল কোনও উপকার হইল না অধিকন্তু কাসির সঙ্গে রক্ত উঠিতে লাগিল। আর একজন ডাক্তার ডাকা হইল। তিনি আসিয়া রক্ত পরীক্ষার ব্যবস্থা করিলেন। রীতিমত

চিকিৎসা আরম্ভ হইল। সেবন, মর্দ্দন, সন্তাপন, ইনহেলন, আচ্ছাদন, প্রক্ষালন, একে একে সমস্তই আচরিত হইল। এ যেন তান্ত্রিকের স্তম্ভন, বিদ্বেষণ, উচ্চাটনাদি ষট্‌কর্ম্ম সাধন! গৃহস্থের প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ। অবশেষে ডাক্তার বাবু বলিলেন—"ভাল জায়গায় "চেঞ্জ" দিন, 'চেঞ্জ' অর্থে ডাক্তারী মতে "গঙ্গাযাত্রা" আমরা তাহা বুঝিলাম। বন্ধু বান্ধবেরা বলিলেন—"এ সকল রোগে—পুরীর জল হাওরাই ভাল।" অগত্যা ডেপুটী বাবু পুরুষোত্তমের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। আমাকে সঙ্গে লইতে ছাড়িলেন না। আমার ভয় হইল-পাছে যক্ষ্মা রোগীর সংস্পর্শে থাকিয়া আমাদের ও যক্ষ্মা হয়। স্ত্রীকে সাবধান করিয়া দিলাম। তিনি কিন্তু আমার কথা গ্রাহ্য ও করিলেন না। বিদেশের নির্ব্বান্ধব পুরে, তিনি যখন সেই মরণাহতা নারীর শয্যালুণ্ঠিত মস্তক, মায়ের মত নিজের কোলে তুলিয়া লইলেন, তখন আমার মনে হইল, এক স্বর্গের দেবী তাঁহার স্নেহময় করস্পর্শে সঞ্জীবনী সুধা সেচনে বুঝি রোগিণীকে রোগমুক্ত করিয়া, নবজীবন দান করিতে মৃত্যুমলিন রোগ শয্যার পার্শ্বে আবির্ভূতা হইয়াছেন। এই সেবাপরায়ণা সুন্দরীকে, আমি যে রোগিণীর সুশ্রুষা করিতে বারণ করিয়া ছিলাম সেজন্য অনুতপ্ত হইলাম।

পুরীতে আসিয়া প্রথমে রোগিণীর অবস্থা একটু ভাল বোধ হইয়াছিল। কিন্তু সে ভাব বেশী দিন থাকিল না। আবার জ্বর বাড়িল, কাসির সঙ্গে রক্ত উঠিতে লাগিল, উদরাময় দেখা দিল। সেই সময় একজন সাহেব ডাক্তার পুরীতে বেড়াইতে গিয়াছিলেন, তাঁহার সঙ্গে আমার আলাপ ছিল। তিনি যেস্থানে সিভিল সার্জ্জন ছিলেন, সেই স্থানে আমিও কিছুদিন সরকারী কার্য্য করিয়াছিলাম। সেই সূত্রেই তাঁহার কাছে পরিচিত হইয়াছিলাম। সাহেবকে আমাদের বিপদের কথা জানাইলাম। তিনি তৎক্ষণাৎ রোগিণীকে দেখিতে আসিলেন। দেখিয়া বলিলেন "এখন রোগ চিকিৎসার অতীত হইয়া গিয়াছে, ঔষধ সেবনে কোনও ফল হইবে না। ইনি কখনও পরিশ্রম করিতেন না, সেই জন্য অম্লরোগ ও অজীর্ণ রোগে ইহার স্বাস্থ্য একেবারেই ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। সেই অজীর্ণ হইতেই 'টিউবারকুলিসিস্' জন্মিয়াছে। এখন আর কোনও উপায় নাই। আমি আর কি করিব?"

বাস্তবিক তিনি আর কি করিবেন? তবে তিনি যে অসামান্য উদারতা দেখাইলেন, এজীবনে তাহা ভুলিব না। আমরা টাকা দিতে গেলাম, তিনি লইলেন না।

রোগিণী আর পুরীতে থাকিতে চাহিল না। বলিলেন—"আমায় সেই কাটোয়ায় লইয়া চল। শান্তিময় স্থানে শান্তিতে মরিতে দাও।" অনেক কষ্টে আবার তাঁহাকে কাটোয়ায় ফিরাইয়া আনিলাম। একটা কথা বলিতে ভুলিয়াছি। কলিকাতায় থাকিবার সময় রোগিণীকে কিছুদিন হোমিওপ্যাথিক ঔষধ খাওয়ান হইয়াছিল। কাটোয়ায় আসিলে প্রতিবেশী বন্ধুগণ বলিলেন—"এইবার কবিরাজী চিকিৎসা হউক। কথাটা যুক্তিযুক্ত মনে হইল। কিন্তু ডেপুটীবাবু একেবারেই অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। তিনি স্পষ্টই বলিলেন চিকিৎসায় অনেক টাকা খরচ হইয়া গিয়াছে। কবিরাজ দেখাইতে গেলে, আবার কলিকাতায় লইয়া যাইতে হইবে। এখন তাহা

একেবারেই অসম্ভব। এ অবস্থায় রোগিণীকে নাড়া চাড়া করা বিপদ্ জনক। কলিকাতা হইতে কবিরাজ আনিতে গেলেও—পর্য্যাপ্ত পরিমাণে অর্থব্যয় করিতে হইবে। অতএব ও সঙ্কল্প ত্যাগ করুণ।" আমার তাহাতে আপত্তি ছিল না, কিন্তু আমার স্ত্রী কোন কথা শুনিলেন না। তিনি কাটোয়া হইতেই একজন বৈদ্যকে আহ্বান করিলেন। বৈদ্যটীর বয়স হইয়াছিল; শ্রীখণ্ড গ্রামে তাঁহার বাড়ী। গো-যানে চড়িয়া, এক পা' ধূলা মাখিয়া, ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে বৈদ্যরাজ উপস্থিত হইলেন! রোগিণীকে উত্তমরূপে পরীক্ষা করিলেন, প্রায় আধঘণ্টা নাড়ী টিপিয়া বসিয়া রহিলেন! তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে মনে হইল— ভগবানের আদালতে ইহাই বুঝি সাক্ষীর জেরা!" বৈদ্য গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়িতে নাড়িতে মন্তব্য প্রকাশ করিলেন "রোগ কঠিনবটে! দেখি, কি করিতে পারি!" হায় বৃদ্ধ! এখনও আশা দিতেছ? দেখিতেছি, তোমার "বিনাশ কালে বিপরীত বুদ্ধির" উদয় হইতেছে!

বোধ হয় কবিরাজ মহাশয় আমাদের মনোভাব বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাই ঈষৎ হাসিয়া আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন— আমার ঔষধ সেবন করাইতে সম্ভবতঃ আপনারা আপত্তি করিবেন না। কেননা,— কোনও ডাক্তারই আর এ রোগিণীর চিকিৎসায় অগ্রসর হইবেন না। সুতরাং দায়ে পড়িয়া—আমার বা আমার সধর্ম্মী কাহারও ঔষধ খাওয়াইতে হইবে। কিন্তু, আমিও রোগীণীকে কোনও পাকা ঔষধ দিব না। একটা পাচন লিখিয়া দিয়া যাইতেছি, ১৫ দিন তাহা খাওয়ান, তার পর আর একবার দেখিয়া সময়োচিত ব্যবস্থা করিব।

পাচনের ফর্দ্দ লিখিয়া দিয়া, দুইটী টাকা দর্শনী লইয়া, গো-যানে চড়িয়া কবিরাজ চলিয়া গেলেন। আমার স্ত্রী জোর করিয়া পাচন আনাইলেন। আমরা কেবল কৌতূহলী হইয়া তাহার ফলের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।

চারিদিন পরে বুঝাগেল—ঔষধ ধরিয়াছে। রোগিণীর কাসি বেশ কমিয়া গিয়াছে, ক্ষুধাও বাড়িয়াছে। ১২দিন পরে দেখিলাম— রোগিণী বালিসে ঠেস্ দিয়া বসিতে পারিয়াছেন। ১৫ দিনের দিন কবিরাজ আবার আসিলেন, রোগিণীকে দেখিয়া বলিলেন— "আর ভয় নাই, বিপদ্ কাটিয়া গিয়াছে, আর আমার আসিবার আবশ্যক হইবে না। ঐ পাচন—এখনও ১মাস খাওয়াইবেন।"

তাহাই হইল। রোগিণী দিন দিন সুস্থ হইতে লাগিলেন। এক মাসের মধ্যে জ্বর বন্ধ হইয়া গেল। আমরা বিস্ময়ে অবাক্ হইলাম। সভ্যতার অহঙ্কারে স্ফীত ডেপুটী বাবুর প্রাণে—আবার ঋষিত্বের অভিমান আসিল। এ কি ইন্দ্রজাল? যে রোগ বড় বড় ডাক্তারে আরাম করিতে পারিল না, সে রোগ একজন পাড়াগেঁয়ে কবিরাজ ভাল করিল? সাহিত্যিক বন্ধু—ব্রজবল্লভের আনুপ্রাসিক ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়— 'কত কোট্‌কেনা, কত কফ্‌কিওর, কেপ্‌লারের কর্ডালিভার, কিছুতেই যে কাসি কমে নাই' সেই কাসি কিনা সামান্য জড়িবুটী ভৌতিক ব্যাপারের মত অক[illegible] করিল? ইহাই কি মন্ত্র শক্তি

বহুদিন পূর্ব্বে আচার্য্য প্রবন্ধে পড়িয়াছিলাম—'

কাহাকে বলে তাহা জানেনা; বোঝেনা, ভাবেনা। ভারতবর্ষ—ভগবানের অপূর্ব্ব সৃষ্টি। দেখিবার বস্তু বটে! কিন্তু আমরা ভারত সন্তান, এহেন ভারত আমরা দেখিনাই দেখিব না। * * * * দেখিবার সামগ্রী বটে—কিন্তু আমরা দেখিলাম না।' তখন সাহিত্য ধুরন্ধরের এই মর্ম্মবাণী সহসা মনে পড়িয়া গেল। বাস্তবিক ভারতের ত কিছুই আমরা জানিলাম না। ভারতের 'আয়ুর্ব্বেদ' অযত্ন মলিন ভাবে পড়িয়া রহিয়াছে, আমরা ত তাহার আদর বুঝিলাম না! ল্যাণ্ডো-চড়া, মোটরা-রোজ, জীবন্ত বিজ্ঞানের প্রতিনিধি, যে রোগ অসাধ্য বলিয়া ছিলেন, গোয়াল বিহারী বৈদ্য সে রোগ যে অনায়াসে জয় করিলেন,—সে ত কেবল আয়ুর্ব্বেদেরই অপূর্ব্ব মহিমায় হতভাগ্য আমরা ভারতের কিছুই দেখিলাম না, কিছুই বুঝিলাম না, তাই সার্ব্ববর্ণিক বিদ্যা চর্চ্চাতেও আজিও আমাদের দুঃখ ঘুচিল না।

যে পাচন খাইয়া আমার শ্যালিকা মৃত্যুমুখ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন,—নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম।

১। কণ্টিকারী, ২। দুরালভা, ৩। কুড় ৪। বাসক ছাল, ৫। কাঁকড়া শৃঙ্গি, ৬। পলতা, ৭। মুথা, ৮। কটুকী ৯। চিরতা, ১০। লবঙ্গ, ১১। গুলঞ্চ, ১২। চই, ১২। পিপুল মূল, ১৪। পিপুল, ১৫। শুঁঠ ১৬। গজ পিপুল, ১৭। জায়ফল ১৮। বামন হাঁটী, ১৯। গন্ধ ভাদুলে, ২০। দারু হরিদ্রা।

এই কুড়িখানি মসলা, প্রত্যেকটী ৮কুঁচ ওজনে লইয়া আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ইহাই দুই বেলা খাওয়ান হইয়াছিল। পুরাতন জর ও কাস রোগে—সাধারণে ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।

পাচনের ফর্দ্দখানি—ডেপুটী বাবু এখনও ইষ্টকবচের মত সযত্নে রক্ষা করিতেছেন। *

শ্রীসুরেন্দ্র নাথ রায়
(বিএ, বিএল)

গোমাতা।

ভারতবর্ষে আবহমানকাল হইতে গো-সেবা মাতৃ সেবার ন্যায় পুণ্য কার্য্য মধ্যে পরিগণিত হইয়া আসিতেছিল; কিন্তু বর্ত্তমানে [illegible] বিদেশীয় শিক্ষা দীক্ষায় অনুপ্রাণিত [illegible]ধর্ম্ম-ভ্রষ্ট অনার্য্যের ন্যায় গো সেবা [illegible] শারীরিক, মানসিক ও আধ্যা- [illegible] দুঃখকে সুখ বলিয়া আলি- [illegible]গো মাতা বলিয়া আর্য্যদের [illegible]ত্মিক কাজের মধ্যে ছিল। এমন কি গো-সেবা না করিয়া কোন ও কার্য্য আরম্ভ হইত না। বস্তুতঃ মানুষের

* যাঁহাদের বাটীতে দুশ্চিকিৎস্য রোগ—কবিরাজী ঔষধে আরোগ্য হইয়াছে, যাঁহারা আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধের গুণ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে সেই সংবাদ লিখিবার জন্য আমরা অনুরোধ করিতেছি। "আয়ুর্ব্বেদের জয়" শীর্ষক অধ্যায়ে আমরা ক্রমশঃ তাহা প্রকাশ করিব।

আঃ সং।

জীবন গরুর নিকট সর্ব্বতো ভাবে ঋণী। জন্মাবচ্ছিন্নে সকল কাজেই গাভীর উপকারিতা বর্ত্তমান।

ভূমিষ্ঠ হইয়া আমরা মাতৃস্তন্য কয়েক মাস মাত্র পান করিয়া জীবিত থাকি; কিন্তু মাতৃ-রূপিণী গাভীর পীযূষ পান করিয়া চিরকাল জীবিত থাকিতে পারি। ভূমিষ্ঠ কাল হইতে আজীবন আমরা গো দুগ্ধ পান করিয়া জীবিত থাকিতে পারি বলিয়াই, গাভীকে আর্য্যশাস্ত্র কারেরা সপ্ত মাতার মধ্যে স্থান দিয়াছেন। সপ্ত মাতা যথা—"আদৌ মাতা গুরোঃ পত্নী ব্রাহ্মণী রাজপত্নিকা। গাভী ধাত্রী তথা পৃথ্বী সপ্তৈতা মাতরঃ স্মৃতাঃ॥" জীবন ধারণ ও পোষণের পক্ষে মানবের যত কিছু প্রয়োজন তাহার অধিকাংশই গোমাতা হইতে সংগৃহীত হইয়া থাকে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে বিশেষ চিন্তা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়—গোমাতা আমাদের সকল কার্য্যেরই সহায়তাকারিণী। এইজন্যই বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে—

"গোমূত্রং গোময়ং ক্ষীরং সর্পি র্দধিচ রোচনী। ষড়ঙ্গ মেতন্মঙ্গল্যং পবিত্রং সর্ব্বদা গবাম্"॥ ইতি শুদ্ধিতত্ত্বম্। গোমূত্র, গোময়, দুগ্ধ, ঘৃত, দধি ও গোরোচনা এই ছয়টী মঙ্গল্য ও পবিত্রকর দ্রব্য।

খাদ্য শস্যের জন্য কৃষি কার্য্যে গরুর প্রয়োজনীয়তা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। যখনই ঋষিগণ মানবের আহারার্থে পঞ্চ শস্য আবিষ্কার করিয়া সমাজে চাষের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তখনই গোমেধ যজ্ঞ নিষিদ্ধ বলিয়া প্রচারিত হইল। সেই সময়ে ভারতে গোরক্ষার বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি পড়িয়াছিল, বোধ হয় সেজন্যই বিধিবদ্ধ শাস্ত্র দ্বারা উন্মার্গগামী মানবদিগের কল্যাণ কামনায় গোবধ জনিত প্রায়শ্চিত্তা-দির বাধ্যতা মূলক শাস্ত্র প্রণয়ন হয়। যে কেহ জ্ঞানকৃত বা অজ্ঞানকৃত অপ্রতিপালন জন্য বা গোবধে লিপ্ত থাকিলে, প্রায়শ্চিত্তী হইতে হইবে।

কৃষিকার্য্য আমাদের দেশে বলীবর্দ্দ ব্যতীত হয় না। চাষ করিতে গরুর প্রয়োজন, ক্ষেতে সার দিতে গোময় প্রধান উপাদান, গোমূত্র ক্ষেত্রের কীটনাশক সুতরাং এদেশে চাষ কার্য্য গরুর সাহায্য ব্যতীত হয় না। পঞ্চগব্য জরায়ুর কীট নাশক বলিয়া গর্ভাধানের সময় যোষিৎ বর্গের সেবিত। তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ অতি গবেষণায় স্থির করিয়াছিলেন দূষিত বায়ু নাশ করিতে গোময়ের তুল্য সহজ লভ্য দ্রব্য ভারতে আর নাই। সেই জন্যই অদ্যাপি ও হিন্দুর গৃহ প্রাঙ্গনে প্রাভাতিক গোময় ছড়া প্রচলিত। আমাদের যাগ যজ্ঞ, ব্রত, নিয়ম সকলই গো-সেবায় পরিপুষ্ট। পূর্ব্বকালে পুণ্যতপা ঋষিগণ বিশুদ্ধ ঘৃতদ্বারা যজ্ঞ সম্পাদন করিতেন বলিয়াই সুকালে সুবৃষ্টি দ্বারা বসুন্ধরা শস্যপূর্ণা হইতেন।

সর্ব্ব-লোকাদর্শ পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ বাল্য জীবন গো সেবায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে, গো সেবা না হইলে চিত্ত সংশুদ্ধি হয় না, এবং চিত্তশুদ্ধি না হইলে দেশের উন্নতিকার্য্যে আত্মনিয়োগ হয় না। বিশ্রুত-কীর্ত্তি-বিরাট রাজ গোধন প্রতিপালন করিয়া ভারতে অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। কর্ম্মবীর বিশ্বামিত্র গোধনের মহীয়সী ক্ষমতা দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া গোধন আকাঙ্খায়ই ক্ষত্র জীবনের উন্নতি সাধন করিয়া মহর্ষি হইয়া ছিলেন। দিলীপ প্রভৃতি রাজন্য বর্গ গো সেবায় আত্ম নিয়োগ করিয়া

ধন্ত হইয়া ছিলেন। ভারতে গো সেবার পুণ্য আছে বলিয়া আব্রাহ্মণ সকলেই এই পবিত্র কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিত। পুরাকালে পর-মুখাপেক্ষী হওয়া পাপ মনে করা হইত। সেই জন্তই শাস্ত্রে কথিত আছে "গাবঃ পবিত্রা মঙ্গল্যা দেবানামপি দেবতাঃ। যস্তাঃ শুশ্রূষতে ভক্ত্যা স পাপেভ্যঃ প্রমুচ্যতে॥" হিন্দুর গো সেবায় পুণ্য আছে পাপ নাই। এপ্রকার পবিত্র কার্য্যেও সময়ের দোষে এদেশে শিথিলতা পরিলক্ষিত হয়। বড়ই দুঃখের কথা। ভারতের আর সে দিন নাই, এখন গোরক্ষায় উচ্চশিক্ষিত ভদ্র মহোদয়গণের দৃষ্টি নাই। তাঁহারা গো-সেবা বা প্রতিপালনের ভার গোপজাতির উপর বিন্যস্ত করিয়া প্রণষ্ট স্বাস্থ্যের জন্য দেশের জল বায়ুর দোষ দিতেছেন। অনেকেই মুখরোচক, সুখাদ্য, পুষ্টিকারক ও শরীরের উপযোগী বলিয়া দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, নবনীতে বিশেষ প্রীতি রাখেন বটে কিন্তু তাঁহারা একবার ও ভাবিয়া দেখেন না যে, ঐ সকল দ্রব্য অধুনা কি প্রণালীতে সংগৃহীত হইতেছে। যতদিন না আর্য্য সন্তানগণ তাহাদের পুরাতন প্রথা অবলম্বন করিবেন ততদিন কিছুতেই বিশুদ্ধ দুগ্ধ, দধি, ঘৃতাদি মিলিবেনা। আমাদের গো-সেবা নিত্য কার্য্যের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট করিতে হইবে; তাহা না হইলে দিন দিন আর্য্য সন্তানগণ উৎকৃষ্ট দুগ্ধ ঘৃতাদির অভাবেই ক্ষীয়মান হইবে। যে দীনতা ও মলিনতার ছায়ায় আজ ভারত সন্তানগণের মুখপঙ্কজ মলিন, তাহা স্বীয় আচার ভ্রংশ জনিত পাপেই হইয়াছে।

কবিরাজ—

শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত বিদ্যাবিনোদ।

চরকোক্ত।

ত্রয়োদশ প্রকার স্বেদের বিধান।

সঙ্কর, প্রস্তর, নাড়ী, স্বেদাবগাহন।
পরিষেক স্বেদ আর তথা অশ্মঘন॥
কর্ষু, কুটী, ভূমি, কুম্ভী কূপ ও হোলাক।
ত্রয়োদশ বিধ স্বেদ সহিত জেন্তাক॥

১

স্বেদ্য দ্রব্য বস্ত্রোপরি পুঁটুলী করিয়া।
উষ্ণকরি, পিণ্ডাকারে অথবা পেষিয়া॥
যে সকল স্বেদ কার্য্য হয় সম্পাদন।
তাহাকে সঙ্কর স্বেদ কহে সুধীগণ॥

২

শূক, শামী, পুলাকাদি ধান্য সিদ্ধ করি।
উৎকারিকা, বেশবার, পায়স, খিচরি॥
প্রভৃতি প্রস্তুত করি, গরম থাকিতে।
দেহের প্রমাণ পাত্রে হইবে লেপিতে॥
তদুপরি পট্টবস্ত্র, কম্বল পাতিয়া।
এরণ্ড, আকন্দ পত্র কিম্বা বিছাইয়া॥
তৈলাভ্যক্ত করি রোগী তাতে শোয়াইবে।
এরূপে প্রস্তর স্বেদ সমাধা হইবে॥

৩

স্বেদ্যদ্রব্য-ফল, মূল, পত্র, শুঙ্গা কিবা।
উষ্ণবীর্য্য পশ্বাদির মাংস শির নিবা॥
যথাযুক্ত অম্ল-লুন-ঘৃতাদি সংযোগে।
কিম্বা মূত্র ক্ষীর আদি বিহিত যে রোগে।

হাঁড়ীর মধ্যেতে রাখি মুখ বান্ধি তার।
জালদিবে বাষ্প যেন না সরে তাহার॥
মুখবন্ধ শরাটীর ছিদ্র করি নিবে।
নল বসাইয়া তাতে বাষ্প স্বেদ দিবে॥
করঞ্জ, আকন্দ, শর, বংশ পত্রে কিবা।
হস্তি শুণ্ড সমস্থূল নলটী করিবা॥
এক ব্যাম-চতুর্ভাগ মূলের পরিধি।
অগ্রভাগ অষ্টমাংশ দীর্ঘ তাব বিধি॥
নল ছিদ্র বায়ুনাশি-পত্রেরুদ্ধ হবে।
দুই তিন স্থান তার বক্র হয়ে রবে॥
বাতহর দ্রব্য সিদ্ধ তৈল ঘৃত দিয়া।
রোগীর সর্ব্বাঙ্গ নিবে পূর্ব্বেই মাখিয়া॥
নল, বক্র হলে বেগপ্রচণ্ড না হবে।
স্বেদ সুখকর তায় প্রদাহ না রবে॥
এইরূপ স্বেদ যাতে হয় সম্পাদন।
নাড়ী স্বেদ বলি তাকে কহে সুধীগণ॥

৪

বায়ুনাশি-দ্রব্য-কাথ, ক্ষীব তৈল, ঘৃত।
মাংস রস কিম্বা উষ্ণ জল পরিবৃত॥
টবেতে অবগাহন স্বেদার্থ করিবে।
অবগাহন স্বেদ নাম তাহার জানিবে॥

৫

বায়ুনাশি-উদ্ভিদেব ফল মূল দিয়া।
কাথকরি, সুখ উষ্ণ, কলসী পূরিয়া॥
ঘটী বা নলবিশিষ্ট কোন পাত্রে পূরি।
রোগীর শরীরে ধীবে সেচিবে সে বারি॥
সেচনের পূর্ব্বে তার দোষ বিচারিয়া।
উপযুক্ত সিদ্ধ তৈল ঘৃত মাখাইয়া॥
বস্ত্র দ্বারা করিবেক দেহ আচ্ছাদন।
পরিষেক স্বেদ একে কহে সুধীগণ।

৬

স্বেদ্য রোগী-শয্যাসম প্রস্তরের ঘণ।
শিলা তাপি কাষ্ঠানলে বায়ু বিনাশন॥
উত্তপ্ত হইলে তাহা করি নিৰ্বাপিত।
উষ্ণ জলে শিলাখানি ধুইয়া ত্বরিত॥
তদুপরি কৌষেয় বা মেষ রোম জাত।
কিম্বা কম্বলাদি শয্যা করিবে প্রস্তুত॥
ঘৃতাদি অভ্যক্ত করি শোয়াবে তথায়।
ঘনবস্ত্র আবরণ করি তার গায়॥
এরূপ স্বেদের নাম হয় অশ্মঘন।
অতঃপর কর্ষূ স্বেদ করিব বর্ণন॥

৭

অভ্যন্তব সুবিস্তীর্ণ সঙ্কীর্ণ বদন।
একপ গর্ত্তকে কর্ষূ কহে বুধগণ॥
স্থানের যোগ্যতা বুঝি করে বৈদ্যগণ।
বোগীর শয্যার নিম্নে গর্ত্তের খনন॥
গর্ত্ত পূরি ধূম শূন্য জলন্ত অঙ্গারে।
তদুপরি খট্টা দিতে শোয়াইবে তারে॥
এরূপে যে সব স্বেদ করিবে গ্রহণ।
কর্ষূ স্বেদ নাম তার কহে বৈদ্যগণ॥

৮

অনতি উচ্চ বিস্তার, গোলাকার হবে।
কুটীরেব ঘন ভিত্তি, জানালা না রবে॥
কুড়াদি সুগন্ধি দ্রব্য প্রলিপ্ত করিয়া।
তাহাতে বিস্তীর্ণ শয্যা লইবে পাড়িয়া॥
প্রাবার অজিন, কুথ, কৌষেয়, কম্বল।
শয্যার উপকরণ হবে এ সকল॥
অঙ্গারাগ্নি পূর্ণ হাঁড়ী চতুর্দ্দিগে রবে।
তৈল কিম্বা ঘৃত মাখি রোগী শয্যা লবে॥
শুইয়া সুখেতে স্বেদ করিবে গ্রহণ।
ইহাকেই কুটী স্বেদ কহে বুধগণ॥

৯

অশ্মঘন ভূমি স্বেদ একই প্রকার।
প্রস্তরের স্থানে ভূমি শুধু ভিন্নতার॥

১০

বাতঘ্ন দ্রব্যের কাথে কুম্ভ পূর্ণ করি।
অর্দ্ধ, ত্রিভাগ কিম্বা ভূমি মধ্যে ভরি॥

কলসী উপরে, অতি স্থূল সূক্ষ্ম নয়।
এরূপ আসন, শয্যা স্থাপিবে নিশ্চয়॥
পরে লৌহ শিলা খণ্ড উত্তপ্ত করিয়া।
লইবে সে কুম্ভী মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া॥
বায়ুনাশি স্নেহা ভ্যক্ত; বস্ত্র পরাইয়া।
কুম্ভ বাষ্প স্বেদ দিবে আসনে বসিয়া॥
যেরূপে এ সুখে স্বেদ হয় সম্পাদন।
কুম্ভীস্বেদ নাম তার কহে সুধীগণ॥

১১

রোগীর শয্যার সম কূপের বিস্তার।
দ্বিগুণ প্রামাণ হবে গভীর তাহার॥
বায়ু শূন্য স্থান, তার মধ্য সুমার্জ্জিত।
গজাশ্ব গর্দ্দভ উষ্ট্র গোঘুঁটে পূর্ণিত॥
অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করি নির্ধূম হইলে।
অঙ্গার তুলিয়া তথা শয্যা বিস্তারিবে॥
বায়ুনাশি স্নেহ মাখি, বস্ত্র আচ্ছাদিয়া।
সুখে স্বেদ দিবে রোগী শয্যায় শুইয়া॥
যাহাতে এরূপ স্বেদ হয় সম্পাদন।
তাহাকেই কূপ-স্বেদ কহে বুধগণ॥

১২

বৃহৎ পিত্তল পাত্রে রোগী শয্যা সম।
গবাদি ঘুঁটায় দগ্ধ করিয়া উত্তম॥
উত্তপ্ত হইলে উহা, অগ্নি উঠাইয়া।
তদুপরি শয্যা নিবে রচনা করিয়া॥
স্নেহা ভ্যক্ত করি রোগী করিবে শয়ন।
অবশ্য থাকিবে তার গাত্র আবরণ॥
অক্লেশে এস্বেদ রোগী গ্রহণ করিবে।
ইহাকে হোলাক-স্বেদ সকলে কহিবে॥

১৩

জেন্তাক-স্বেদেতে স্থান পরীক্ষা উচিত।
রোগী গৃহ পূর্ব্বোত্তরে হবে তা নিশ্চিত॥
ফল ফুল সুশোভিত, তুষাঙ্গার হীন।
কৃষ্ণ বা সুবর্ণ বর্ণ মাটি তদধীন॥
নদী দীঘি পুষ্করিণী জলাশয় কূলে।
ঘাটের সমীপে স্থান হবে সমতলে॥
সাত কিম্বা আট হাত দূরেতে তাহার।
পূর্ব্ব বা উত্তর দ্বারী হবে কূটাগার॥
উচ্চতা বিস্তার তার ষোল হাত রবে।
মৃত্তিকায় [illegible] গৃহ গোলাকার হবে॥
উহাতে অনেকগুলি জানালা রাখিবে।
অভ্যন্তরে চারিদিকে পিণ্ডিকা গড়িবে॥

এক হস্ত পরিসর উচ্চতা তাহার।
কপাটের ধারে শুধু বাদ রবে তার॥
মধ্যস্থলে চারিহস্ত প্রশস্ত অপর।
সাতহাত; সূক্ষ্মছিদ্র রবে বহুতর॥
কন্দুর সদৃশ এক উনন করিবে।
তদূর্দ্ধ ঢাকিতে এক ঢাকনা গড়িবে॥
উননে খদির কাষ্ঠ, অশ্বকর্ণ কিবা।
পবিত্র কাষ্ঠাদি পূরি অগ্নিজ্বালি দিবা॥
যখন দেখিবে তাহা ধূমহীন আর,
"অগ্ন্যুত্তপ্ত স্বেদ যোগ্য উত্তাপ তাহার।
তখন বায়ু বিনাশি-স্নেহ মাখি গায়।
বস্ত্র আবরিয়া রোগী পাঠাবে তথায়॥
প্রবেশের কালে তারে উপদেশ দিবে।
"কল্যান আরোগ্য জন্য এগৃহে পশিবে॥
গৃহের বেদীর পরে করি আরোহণ।
যে পার্শ্বে লভিবে সুখ করিবে শয়ন॥
ঘর্ম্ম হয়, মূর্চ্ছাহয় জীবন্ত কখন।
বেদীছাড়ি দ্বারে নাহি কর আগমন॥
তথায় আসিলে ঘর্ম্ম মূর্চ্ছাদি হইয়া।
সদ্যঃপ্রাণ হারাইবে রাখিও জানিয়া॥
যখন বুঝিবে কফ বিগত তোমার।
ঘর্ম্মস্রাবরুদ্ধ-স্রোত বিমুক্ত আবার;
দেহলঘু; বিরুদ্ধতা, জড়তা, সুপ্তিভাব।
বেদনা ও ভারবোধ হবে তিরোভাব।
তখন করিবা তুমি বেদীঅনুসরণ।
দ্বারদেশে করিবেক শুভ আগমন॥
বেদীছাড়ি দ্বারদেশে যখন আসিবে।
সহসা শীতল জল নেত্রে নাহি দিবে॥
মুহূর্ত্ত বিশ্রাম পরে সন্তাপ জনিত।
শ্রম অপগত বোধ হলে সুনিশ্চিত॥
সুখোষ্ণ জলেতে স্নান; আহার করিবে।
ইহাকে জেন্তাক স্বেদ সকলে কহিবে॥

কবিরাজ
শ্রীরাসবিহারি রায় কবিকঙ্কণ।

রোগবিনিশ্চয়।

জ্বর

জ্বরোৎপত্তির কারণ।

নিম্নলিখিত কারণে মনুষ্যের জ্বর রোগ উৎপন্ন হয়—

মিথ্যা আহার, মিথ্যা বিহার, মিথ্যাপ্রযুক্ত রসায়ন, মিথ্যাযুক্ত বা অতিযুক্ত স্নেহাদি কর্ম্ম অর্থাৎ স্নেহ-স্বেদ-বমন—বিরেচনের ও বস্তির অতিযোগ বা মিথ্যাযোগ, বিবিধ অভিঘাত, রোগ বিপর্য্যয়, ব্রণাদির পাক, অতিশ্রম, ক্ষয়, অজীর্ণদোষ, বিষভোজন, সাত্ম্যবিপর্য্যয়, ঋতু-বিপর্য্যয়, বিষবৃক্ষের পুষ্পগন্ধাঘ্রাণ, শোক, নক্ষত্র ও ক্রূর গ্রহপীড়া, অভিচার, অভিশাপ, কামাদি অভিসঙ্গ, ভূতাদিসঙ্গ; (স্ত্রীপক্ষে)—প্রসবের অনিয়ম, প্রসবান্তে অহিত সেবা, স্তন্যাবতরণ, স্তনদুগ্ধের দোষ (শিশু পক্ষে)।

মিথ্যা আহার।

আহার আবার মিথ্যা সত্য কি? আহারের উদ্দেশ্য শরীররক্ষা, কেবল চর্ব্বণ ও গলাধঃকরণ করিলেই আহারের উদ্দেশ্য-সিদ্ধি হয় না। ভুক্ত বস্তু যদি পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া শরীর ধারণ ও পোষণের অনুকূল হয় তবেই তাহাকে যথার্থ আহার বলিব। যে আহার দ্বারা এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না তাহাকে মিথ্যা আহার বলে। আটটী বিষয় বিবেচনা না করিয়া আহার করিলে আহার মিথ্যা হইয়া থাকে। সেই আটটী বিষয় যথা—(১) প্রকৃতি (২) করণ (৩) সংযোগ (৪) রাশি (৫) দেশ (৬) কাল (৭) উপযোগ-সংস্থা (৮) উপযোক্তা।

(১) প্রকৃতি শব্দের অর্থ স্বভাব। খাদ্যের স্বাভাবিক গুণকে প্রকৃতি বলে। মাষকলায়ের গুরুত্ব মুগকলায়ের লঘুত্ব, মাষ ও মুগের প্রকৃতি। এইরূপ সকল খাদ্য দ্রব্যেরই এক বা বহু স্বাভাবিক গুণ আছে। শরীরের অবস্থানুসারে এই সকল গুণ বিবেচনা করিয়া আহার করিতে হয়—না করিলে আহারের মিথ্যাযোগ অর্থাৎ সে আহার শরীরের পক্ষে হিতকর হয় না। সুতরাং রোগের কারণ হইয়া থাকে।

(২) করণ—স্বাভাবিক দ্রব্যের সংস্কারের নাম করণ। সংস্কার দ্বারা দ্রব্যের গুণান্তর হইয়া থাকে। এই সংস্কার আটপ্রকারে সাধিত হইয়া থাকে যথা—জল, অগ্নি, শোধন, মন্থন, দেশ, বাসন, ভাবনা ও পাত্র *।

(৩) সংযোগ—দুই বা বহু বস্তুর মিশ্রীভাবকে সংযোগ বলে। সংযোগের পূর্ব্বে সেই সেই বস্তুতে যে গুণ ছিল না সংযোগের পর তাহাতে এমন অনেক অপূর্ব্বগুণেরও আবির্ভাব হয়। মধু ও ঘৃতের মধ্যে কোনটীই মারক নহে কিন্তু মধু ঘৃত তুল্য পরিমাণে মিশ্রিত হইলে মারক হয়। মধু, মাংস, দুগ্ধ তিনটীর কোনটীই কুষ্ঠকারি নহে কিন্তু দুগ্ধ, মধু মৎস্যের মিলন কুষ্ঠকারি।

(৪) রাশি—দ্রব্যের মাত্রাকে রাশি বলে। রাশি দুইপ্রকার সর্ব্বগ্রহ রাশি ও পরিগ্রহ রাশি। ভাত, দাল, ব্যঞ্জন, দুগ্ধ মিলিত হইয়া যে পরিমাণ হয় তাহাতে সর্ব্বগ্রহ রাশি এবং এত ভাত, এত দাল, এত ব্যঞ্জন, এত দুগ্ধ প্রভৃতি প্রত্যেকের প্রমাণকে পরিগ্রহ রাশি বলে। এই দ্বিবিধ রাশি অর্থাৎ আহার পরিমাণের উপরি আহারের মিথ্যাত্ব অমিথ্যাত্ব নির্ভর করে।

(৫) দেশ—দেশ শব্দে খাদ্য দ্রব্যের উৎপত্তি ও প্রচার স্থান এবং ভোজন কর্ত্তার অবস্থিতি স্থান বুঝিতে হইবে। খাদ্যদ্রব্যের উৎপত্তি স্থানভেদে গুণান্তরের উদাহরণ—শীতপ্রদেশ জাত দ্রব্য গুরু এবং মরুদেশ জাত দ্রব্য লঘু হইয়া থাকে। দ্রব্যের প্রচার স্থান বিশেষেও

---

* জলদ্বারা সংস্কারে দ্রব্যের গুণান্তর হয় যথা—শুষ্ক কলায় ও ভিজান কলায়, চিনি ও চিনির সরবৎ। অগ্নিদ্বারা সংস্কারে গুণান্তর যথা—কাঁচা ও ভাজা কলায়। অগ্নির স্বরূপ ভেদেও গুণান্তর হয় যেমন কয়লার, কাঠের, ঘুঁটের ও তেলের জ্বালে পাক করা হইলে একই বস্তুর গুণান্তর হয়। শোধন দ্বারা গুণান্তরের উদাহরণ আমরা সকলেই জানি। তণ্ডুলাদি শোধন অর্থাৎ ধৌত করিয়া ব্যবহার না করিলে বিবিধ উৎকট রোগ জন্মিয়া থাকে। মন্থন মওয়া একটী সংস্কার। ইহার দ্বারাও দ্রব্যের গুণান্তর হইয়া থাকে। দধি শোথকারি কিন্তু মথিত দধির ননী না তুলিলেও উহা শোথনাশক হইয়া থাকে। দেশ অর্থাৎ স্থানভেদে দ্রব্যের গুণান্তর হইয়া থাকে এজন্য দেশকেও সংস্কারের অন্তর্গত করা হইয়াছে। উষ্ণজল, বায়ু-প্রবাহ-বর্জ্জিত স্থানে রাখিয়া শীতল করিলে যে গুণ হয়, প্রবাত স্থানে রাখিয়া শীতল করিলে তাদৃশ গুণ হয় না। গাছপাকা ফলের যে গুণ, ফল পাড়িয়া পাত্রাবদ্ধ করিয়া পাকাইলে, এই জাঁকান পাকা ফলের গুণ তাদৃশ হইবে না। অনেক ঔষধ ভস্মরাশি বা ধান্যরাশিতে রাখিবার উপদেশ আছে। বাসন—সংস্কার দ্বারা দ্রব্যের গুণান্তর হইয়া থাকে বাসন শব্দের অর্থ গন্ধাধিবাসন অর্থাৎ কোন সুগন্ধি বস্তুর সংসর্গে কোন দ্রব্যকে সুগন্ধি করা। আমরা যে তরকারীতে মসলা কি গরম মশলা দিয়া থাকি তাহাও একপ্রকার বাসন সংস্কার মাত্র। জল, গোলাপ ফুলের সহিত বাসন-সংস্কারে গোলাপ জলে পরিণত হইয়া থাকে। তিল, পুষ্প সহ অধিবাসিত হইলে সেই তিলজ তৈল ফুলেল তৈল হয়। বলা বাহুল্য জল ও গোলাপ জলের তিল তৈল ও ফুলেল তৈলের গুণ কদাপি এক নহে। ভাবনা সংস্কারের অর্থ এই যে, কোন বস্তুকে কোন রস বা কাথ দ্বারা আপ্লুত করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করা। আমলকী কোন বস্তুর রসে আপ্লুত করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিলে অবশ্যই আমলকীর গুণান্তর হইবে। কালপ্রকর্ষ আর এক সংস্কার—কালপ্রকর্ষে অর্থাৎ পুরাণ হইলে অনেক দ্রব্যেরই গুণান্তর হইয়া থাকে। আমরা সকলেই জানি নুতন ও পুরাণ চাল, ঘৃত, গুড় প্রভৃতির গুণে অনেক তফাৎ। পাত্র বিশেষে ও দ্রব্যের গুণান্তর হয়। শাস্ত্রে রৌপ্য, স্বর্ণ, তাম্র কাংস্যাদি পাত্রে ভোজনের গুণ পৃথক্ পৃথক্ লিখিত হইয়াছে। কুষ্মাণ্ডখণ্ড তাম্র পাত্রে এবং ত্রিকত্রয়দি-লৌহ লৌহপাত্রে পাক ও মর্দ্দন করিবার উপদেশ আছে।

গুণান্তর হয় যথা যে প্রাণী জলাসন্ন ভূমিতে বিচরণ করে কিম্বা গুরু দ্রব্য ভোজন করে তাহার মাংস গুরু এবং যে প্রাণী মরুদেশে বাস করে এবং লঘু বস্তু ভোজন করে তাহার মাংস লঘু হইয়া থাকে। আমরা সকলেই জানি কোন কোন ফল শস্য স্থান বিশেষে যেমন উপাদেয় হয় অন্যত্র তেমন হয় না। দেশ সংস্কার প্রস্তাবে দেশ সাত্ম্যও বিচার করিতে হইবে। রাজপুতনায় মরুপ্রায় দেশে শীত পানীয় ও স্নেহ বহুল বস্তু ভোজন হিতকর কিন্তু হিমগিরি বক্ষঃস্থিত প্রদেশে ঐ সকল দ্রব্য কদাপি হিতকর হইতে পারেনা;—কিন্তু রুক্ষ ও উষ্ণ বস্তু হিতকর হইবে।

(৬) কাল—কালানুসারে বিবেচনা করিয়া ভোজন না করিলে আহার হিতকর হয় না। যাহা বালকের পক্ষে হিতকর, যুবকের পক্ষে তাহা হিতকর না হইতে পারে; যুবকের পক্ষে যাহা হিতকর বৃদ্ধের পক্ষে তাহাই যে হিতকর হইবে বলা যায় না। তারপর সুস্থ বালকের পক্ষে যাহা হিতকর, কিংবা শ্লেষ্মপ্রকৃতির বালকের পক্ষে যাহা হিতকর, রুগ্ন বা পিত্তপ্রকৃতির পক্ষে তাহা হিতকর হইবেনা। গ্রীষ্মে যাহা হিতকর, শীতে তাহা হিতকর নহে। অসময়ে ভোজন বিবিধ পীড়ার কারণ, অতএব কালবিবেচনা পূর্ব্বক আহার গ্রহণ করা নিতান্ত আবশ্যক, অন্যথা আহারের মিথ্যাযোগ ঘটিয়া থাকে।

(৭) উপযোগসংস্থা—ভোজনের বিধিকে উপযোগসংস্থা বলে। যেমন—ভুক্ত খাদ্য জীর্ণ হইলে পুনর্ব্বার ভোজন করিবে, পবিত্র স্থানে হস্ত, পদ, মুখ প্রক্ষালন করিয়া ভোজন করিবে, নিবিষ্ট চিত্তে ভোজন করিবে ইত্যাদি।

(৮) উপযোক্তা—ভোজন কর্ত্তা স্বীয় প্রকৃতি ও অভ্যাসের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া আহার করিবে। ইহার বিপরীত আচরণ করিলে মিথ্যা আহার জন্য পীড়া জন্মিতে পারে। আমি নিরামিষ ভোজন করিতে অভ্যস্ত, কি আমি একবার আহার করিতে অভ্যস্ত, আমি যদি মাংস ভোজন বা দুইবার আহার করি তাহা হইলে আমার পীড়া জন্মিতে পারে। দিবা-নিদ্রা নিষিদ্ধ কিন্তু যাহার দিবানিদ্রা অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে তাহার পক্ষে দিবানিদ্রা হঠাৎ পরিত্যাগ বিধেয় নহে। যে আহার বিহার অহিতকর হইলেও অভ্যাস গুণে ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে হিতকর হইয়া পড়িয়াছে সেই আহার বিহারকে ওকসাত্ম্য বলে।

মিথ্যা বিহার।

স্নান, নিদ্রা, জাগরণ, ভ্রমণ, ক্রীড়া, মৈথুন প্রভৃতিকে বিহার বলে। এই স্নান, নিদ্রাদি কিরূপ ভাবে আচরণ করিলে স্বাস্থ্যের বা রোগারোগ্যের পক্ষে হিতকর হয় শাস্ত্রকার তাহা বলিয়া দিয়াছেন, কিম্বা ব্যক্তিবিশেষের এসকল বিষয়ে বিশেষ বিশেষ অভ্যাস আছে। শাস্ত্র বিধি অনুসারে কিম্বা শাস্ত্র বিরুদ্ধ হইলেও যাহা ব্যক্তিবিশেষের অভ্যাস গুণে সহ্য পাইয়াছে তদনুসারে, স্নানাদির অনুষ্ঠান না করিলেই মিথ্যা বিহার বলিয়া কথিত হয়। স্নান হিতকর বটে কিন্তু দীর্ঘকাল জলে থাকিয়া স্নান কিম্বা ঋতুর প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া স্নান (যেমন শীত-কালে অতিশীতল জলে স্নান কিম্বা গ্রীষ্মে অত্যুষ্ণ জলে স্নান) রোগের কারণ। বিহিত নিদ্রা

স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে হিতকর কিন্তু অতিনিদ্রা—বা অনিদ্রা মিথ্যা বিহার, ইহা বিবিধ রোগের কারণ। জাগরণ—ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শয্যা ত্যাগের উপদেশ আছে—ইহার বিপরীত আচরণ করিলে মিথ্যাবিহার হয়। পরিমিত ব্যায়াম শরীর রক্ষার জন্য নিতান্ত প্রয়োজন, কিন্তু অতিব্যায়াম মিথ্যাবিহার। দুঃসাহস পূর্ব্বক কোন আয়াস জনক কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়াকেও মিথ্যাবিহার বলে। যে ২০ সের বস্তু তুলিতে পারে না সে যদি আড়াই মোণ ভার উঠাইতে চেষ্টা করে কিম্বা যদি কেহ ধাবমান অশ্ব মহিষাদির বেগরোধ করিতে প্রয়াস পায়, তাহা হইলে তাহার মিথ্যা বিহারের অনুষ্ঠান করা হয়—এইরূপ মিথ্যা বিহারকে "অযথা বলারম্ভ" বলে।

মিথ্যাপ্রযুক্ত রসায়ন।

যে ঔষধ শরীরের মালিন্য দূর করিয়া, আরোগ্য, বীর্য্য, কান্তি মেধা ও সুদীর্ঘ আয়ু দান করে। যাহা অকাল জরা হইতে দূরে রাখে সেই ঔষধকে রসায়ন বলে। রসায়ন, যাহাকে তাহাকে যখন তখন প্রয়োগ করা যায় না—শাস্ত্রে রসায়ন প্রয়োগের কতকগুলি বিধি উপদিষ্ট হইয়াছে। চরক সংহিতার চিকিৎসা স্থানের প্রথম অধ্যায়ে রসায়ন বিধি উপদিষ্ট হইয়াছে। এই নিয়ম প্রতিপালন না করিয়া রসায়ন যোগ সেবন করিলে মিথ্যা প্রযুক্ত রসায়ন জন্য জ্বর হয়।

মিথ্যাযুক্ত বা অতিযুক্ত স্নেহাদিকর্ম্ম।

স্নেহাদি কর্ম্ম শব্দে স্নেহপান, স্বেদ, বমন, বিরেচন ও বস্তি এই পঞ্চকর্ম্ম বুঝিতে হইবে। মিথ্যাযুক্ত শব্দের অর্থ অযোগযুক্ত, কেননা স্নেহপানাদির মিথ্যাযোগ সম্ভব নহে। স্নেহপান প্রভৃতি উপরি লিখিত পঞ্চকর্ম্মের সম্যক্‌যোগ, অতিযোগ এবং অযোগ, শাস্ত্রকারেরা এই ত্রিবিধ যোগের উল্লেখ করিয়াছেন। পঞ্চকর্ম্ম ঠিক্ প্রযুক্ত হইয়া কার্য্যকারী হইলে সম্যক্‌যোগ, বমনাদির অত্যন্ত প্রবৃত্তি হইলে অতিযোগ এবং যদি প্রতিলোমভাবে ও অল্পমাত্রায় প্রবৃত্তি হয় অর্থাৎ যদি বমন করাইতে গিয়া বিরেচন কিংবা অল্পবমন কিম্বা বিরেচন করাইতে গিয়া বমন বা অল্পবিরেচন হয় তাহা হইলে অযোগ বলে। পঞ্চকর্ম্মের মধ্যে স্নেহপান ও বস্তির কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা আবশ্যক। বিশেষ ফল লাভের জন্য ব্যক্তিবিশেষকে ঘৃত, তৈল, বসা ও মজ্জা বিধিপূর্ব্বক পান করান হইয়া থাকে ইহারই নাম স্নেহপান। কোন্ কালে, কোন্ লোককে, কত মাত্রায় কত দিন ঐ ঘৃতাদি পান করাইতে হইবে ইহার বিশেষ বিবরণ আয়ুর্গ্রন্থের স্নেহাধিকারে বিবৃত হইয়াছে। বস্তি শব্দের অর্থ পিচকারী দ্বারা গুহ্যমার্গ দিয়া কাথ বা স্নেহযুক্ত কাথ প্রবেশ করান। কেবল কাথ দ্বারা প্রদত্ত বস্তির নাম "নিরূহ বস্তি" এবং স্নেহান্বিত কাথাদি দ্বারা প্রদত্ত বস্তিকে "অনুবাসন বস্তি" বলে।

শস্ত্র, লোষ্ট্র, কশা (চাবুক), কাষ্ঠ, মুষ্টি, নখ, দন্ত ও পতনাদি হইতে প্রাপ্ত আঘাতকে অভিঘাত বলে।

---

* কোন সংগ্রহ পুস্তকে লেখাছিল আমলকীচূর্ণ আমলকীর রসে ৭টা ভাবনা দিয়া সেবন করিলে রসায়নের কার্য্য করে। এই দেখিয়া একজন ভদ্রলোক উহা প্রস্তুত করিয়া সেবন করে এবং সেবনের প্রথম দিনেই ঘোরতর জ্বররোগে পীড়িত হয়। আমি চিকিৎসার্থ আহূত হইয়া রোগের বিবরণ শুনিয়া উপবাস ব্যবস্থা করিলে—জ্বর নিবৃত্তি পাইয়াছিল। এইরূপ বহু উদাহরণ আছে।

সাত্ম্যবিপর্য্যয়—ঋতুবিপর্য্যয় ।

সাত্ম্য শব্দের অর্থ যাহা অভ্যস্ত সুতরাং অপথ্য হইলেও বা অধিক মাত্রায় সেবন করিলেও অহিতকারী হয় না। সাত্ম্য ছয় প্রকার জাতি সাত্ম্য, প্রকৃতি-সাত্ম্য, ঋতুসাত্ম্য, ওকসাত্ম্য দেশ সাত্ম্য, আময়-সাত্ম্য। যে জাতির লোকের যে বস্তু সাত্ম্য তাহাকে জাতিসাত্ম্য বলে যেমন ইংরাজের মাংস, বাঙ্গালীর অন্ন ও দুগ্ধ। চরকের চিকিৎসাস্থানের ৩০ অধ্যায়ের শেষে ভারতীয় কোন কোন জাতির কিকি সাত্ম্য ছিল তাহার উল্লেখ আছে। প্রকৃতি-সাত্ম্য—লোকে চলতিকথায় যাহাকে "ধাত্" বলে (যেমন বায়ুর ধাত্ পিত্তের ধাত্ কফের ধাত্) তাহাই প্রকৃতি। এই প্রকৃতি অনুসারে যাহার যাহা সাত্ম্য তাহাকে প্রকৃতি সাত্ম্য বলে যেমন বায়ু প্রকৃতির স্বাদু, অম্ল ও লবণরস সাত্ম্য, কফ প্রকৃতির কটু, তিক্ত, কষায় রস সাত্ম্য। এই সাত্ম্যের বিপর্য্যয় হইলে অর্থাৎ কফপ্রকৃতির লোক যদি হঠাৎ অধিক পরিমাণে স্বাদু ও অম্লরস কিম্বা বাত প্রকৃতি কটু, তিক্তরস ভোজন করে তাহা হইলে সাত্ম্যবিপর্য্যয়-হেতু উহাদের জ্বর বা অতিসার হইতে পারে। ঋতুসাত্ম্য—যে ঋতুতে যে দ্রব্য ভোজন বা যেরূপ আচার বিহার হিতকর ঋতুচর্য্যাধ্যায়ে তৎসমুদায়ের উল্লেখ আছে। যদি এই ঋতু-সাত্ম্যের বিপর্য্যয় ঘটে তাহা হইলে জ্বর বা অতিসার হইতে পারে। যেমন গ্রীষ্মঋতুতে স্বাদু, শীতল স্নিগ্ধ বস্তু হিতকর ইহার পরিবর্ত্তে যদি কেহ কটু তিক্ত রুক্ষ বস্তু ভোজন করে তাহা হইলে ঋতুসাত্ম্য-বিপর্য্যয়হেতু তাহার জ্বরাদি রোগ হইতে পারে। এইরূপ অন্যান্য ঋতুতেও ব্যাখ্যা করিবে। দেশসাত্ম্য—দেশ তিন প্রকার জাঙ্গল, আনূপ ও সাধারণ। এই তিন প্রকার দেশের জল, বায়ু ভূমি বিভিন্ন গুণাক্রান্ত হওয়ায়, দেশ ভিন্ন ভিন্ন গুণযুক্ত হইয়া থাকে। দেশ যে গুণাক্রান্ত হইবে তাহার বিপরীত গুণ সেই দেশের পক্ষে সাত্ম্য হইবে। স্নেহ ও গৌরব আনূপদেশের গুণ সুতরাং ইহার বিপরীত রৌক্ষ্য ও লাঘব আনূপদেশ সাত্ম্য বুঝিতে হইবে। রোগোপশমকারী আহার বিহারকে আময় সাত্ম্য বলে। স্তন্যাবতরণ শব্দের অর্থে প্রসবের পর স্তনে প্রথম "দুধনামা" ইহার জন্য যে জ্বর হয় লোকে সেই জ্বরকে "ঠুনকোজ্বর" বলে। জ্বর নিদানের অপর দুরূহ শব্দের অর্থ যথাস্থানে কথিত হইবে।

উপরি লিখিত কারণে কুপিত বায়ু, পিত্ত, কফ পৃথক্ ভাবে, সংসৃষ্ট ভাবে অর্থাৎ দুইটী দুইটী মিলিয়া (বাতপিত্ত, বাতশ্লেষ্মা, পিত্তশ্লেষ্মা) কিম্বা সন্নিপতিত হইয়া অর্থাৎ তিনটী একত্র মিলিয়া রসানুগত হইয়া থাকে। অনন্তর রসানুগত দোষ আমাশয় হইতে জাঠরাগ্নিকে (তেজোরূপ পাচক পিত্ত) বহির্নিক্ষিপ্ত করিয়া এই জাঠরাগ্নির উষ্মার সহিত দোষের নিজের উষ্মা মিলিত হইয়া, দেহের উষ্মার বলবৃদ্ধি করিয়া, প্রকুপিত দোষ সমস্ত দেহে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে এবং ঘর্ম্মবাহি স্রোতঃ সকল রুদ্ধ করে। ইহার ফলে দেহে অধিক সন্তাপ জন্মিয়া থাকে সর্ব্বাঙ্গ অত্যন্ত উষ্ণ হয় তখন জ্বর হইয়াছে বলি। তরুণ জ্বরে অগ্নি নিজস্থান হইতে প্রচ্যুত এবং স্রোতঃসকল রুদ্ধ হয় বলিয়া নব জ্বরে প্রায় ঘর্ম্ম হয় না।

জ্বরের বিভাগ ।

সমস্ত জ্বরেই সন্তাপ থাকে সুতরাং সন্তাপ লক্ষণ লইয়া বিচার করিলে জ্বর এক প্রকার

বলিতে হয়। নিজ ও আগন্তু ভেদে জ্বর দুই প্রকার। কারণ ভেদে নিজ জ্বর সাত প্রকার যথা—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, বাতশ্লেষ্মজ, বাতপিত্তজ পিত্তশ্লেষ্মজ ও ত্রিদোষজ। আগন্তুজ্বর এক প্রকার সকল আগন্তু জ্বরই ব্যথাপূর্ব্বক হইয়া থাকে অর্থাৎ কোন না কোন রূপ আঘাত প্রাপ্ত হইলে হয়। এই আগন্তুজ্বর আবার কারণ ভেদে চারি প্রকার যথা—অভিঘাতজ, অভিষঙ্গজ, অভিচারজ ও অভিশাপজ। দোষের বলবত্ব এবং দুর্ব্বলত্ব কালের বলবত্ব এবং দুর্ব্বলত্বহেতু জ্বর আবার পাঁচ প্রকার যথা সন্তত, সতত অন্যেদ্যুঃক, তৃতীয়ক ও চতুর্থক। আশ্রয়ীভূত ধাতু ভেদে জ্বর সাত প্রকার যথা রসগতজ্বর, রক্তগতজ্বর, মাংসগত জ্বর, মেদোগত-জ্বর, অস্থিগতজ্বর, মজ্জগতজ্বর ও শুক্রগতজ্বর। অন্তর্ব্বেগ ও বহির্বেগভেদে জ্বর দুই প্রকার। ইহা ভিন্ন প্রাকৃত, বৈকৃত, সাধ্য, অসাধ্য, সাম, নিরাম, শারীর, মানস সৌম্য, আগ্নেয়ভেদে জ্বরের ভেদ স্বীকৃত হইয়াছে। এই সকল জ্বরের বিবরণ যথা স্থানে কথিত হইবে।

জ্বরের প্রধান লক্ষণ—দেহ ও মনের সন্তাপ। দেহের সন্তাপ বলিলে কেবল শরীরের উত্তাপ বুঝায় না উহার সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রিয়গণের বিকলতাও বুঝায়। ইন্দ্রিয়ের বিকলতা অর্থে যে ইন্দ্রিয়ের যে কার্য্য তদ্বিষয়ে তাহার অন্যথাচার বুঝায়। মনের সন্তাপার্থে চিত্তের বিকলতা—'কিছু ভাল লাগেনা' ভাব এবং গ্লানি বুঝায়।

সর্ব্বজ্বরের সামান্য পূর্ব্বরূপ।

জ্বর স্পষ্টভাবে প্রকাশ পাইবার পূর্ব্বে, রোগীর গাত্র সম্পূর্ণরূপ উষ্ণ হইবার পূর্ব্বে সর্ব্ব-জ্বরেই যে সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায় সেইগুলিকে জ্বরের সাধারণ পূর্ব্বরূপ বলে। নিম্ন লিখিত সমস্ত পূর্ব্বরূপ লক্ষণ প্রায় কাহারও প্রকাশ পায় না দুই চারিটী দেখা যায় মাত্র। যদি কাহারও নিম্নোক্ত সমস্ত পূর্ব্বরূপ প্রকাশ পায় তাহা হইলে তাহার সেই জ্বর অসাধ্য বলিয়া জানিবে। সর্ব্বজ্বরের সাধারণ পূর্ব্বরূপ যথা—পরিশ্রম না করিলেও শ্রান্তি বোধ করা, "কিছুই ভাল লাগেনা" মনের এইরূপভাব, বিবর্ণতা, মুখের বিকৃত স্বাদ, চোখ ছল্‌ছল্‌করা, চোখে জল আসা, কখন ছায়া কখন বা রৌদ্র ভাল লাগে, কখন বাতাস ভাল লাগে, কখন বা নির্বাত স্থানে থাকিতে ইচ্ছা হয়, হাই উঠা, গা ভাঙ্গা, দেহভার, রোমাঞ্চ, আহারে অনিচ্ছা, অন্ধকার দেখা, বিবমিষা ও শীতবোধ অধিক নিদ্রা বা জাগরণ, কম্প, ভ্রম, দাঁত শিড় শিড় করা কোন শব্দ এমন কি গান পর্য্যন্ত ভাল লাগে না, অন্নের অবিপাক, দুর্ব্বলতা, অধিক পিপাসা, পিণ্ডিকোদ্বেষ্টন (পায়ের ডিমে কামড়ান) আলস্য (শক্তি থাকিতে কার্য্যে অনুৎসাহ) দীর্ঘসূত্রতা, কাজে স্ফূর্ত্তি না থাকা।

জ্বরের বিশেষ পূর্ব্বরূপ।

উপরি লিখিত লক্ষণের কতকগুলি বা কোনটী প্রকাশ পাইলে আমারা বুঝিতে পারি যে জ্বর হইবে, কিন্তু কি জ্বর হইবে জানিতে পারি না এইজন্য ঐ লক্ষণগুলিকে জ্বরেব সামান্য পূর্ব্বরূপ বলে। কিন্তু এমন কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ আছে যেগুলি প্রকাশ পাইলে কি জ্বর অর্থাৎ বাতিক পৈত্তিক কি শ্লৈষ্মিক জ্বর হইবে তাহা বলা যায়। এই বিশেষ লক্ষণগুলিকে জ্বরের বিশেষ পূর্ব্বরূপ বলে। সামান্য পূর্ব্বরূপের কোনটী বা কতকগুলির সহিত

যদি অধিক হাই উঠিতে থাকে তাহা হইলে বাতজ্বর, যদি অধিক চক্ষুজ্বালা করে তাহা হইলে পিত্তজ্বর, যদি আহারের প্রতি অনিচ্ছা প্রকাশ পায় তাহা হইলে কফজ্বর হইবে জানা যায়। যদি হাই উঠা ও চক্ষুজ্বালা থাকে তাহা হইলে বাতপিত্তজ, যদি আহারে বিশেষ অনিচ্ছা ও চক্ষুজ্বালা থাকে তাহা হইলে পিত্তশ্লেষ্মজ এবং যদি হাই উঠা ও আহারে অনিচ্ছা থাকে তাহা হইলে বাতশ্লেষ্মজ জ্বর হইবে। আর যদি তিনটীই থাকে তাহা হইলে ত্রিদোষজ্বর হইবে।

বাতজ্বরের নিদান ও লক্ষণ।

অতিরিক্ত শ্রম, মলমূত্রের বেগ ধারণ, অতিমৈথুন, মানসিক উদ্বেগ, শোক, রক্ত-স্রাব, জাগরণ, বিষমশরীরন্যাস অর্থাৎ উচ্চনীচস্থানে শয়ন কিম্বা পা উচ্চ ও মাথা নীচ ভাবে, রাখিয়া শয়ন, বাতজ্বরের কারণ।

কম্প, জ্বরের বেগ কখন অল্প কখনও বেশী, গলা ও ঠোঁট শুষ্ক হওয়া, অনিদ্রা, হাঁচি না হওয়া, রুক্ষ চেহারা, মাথা বুক ও গায়ে বেদনা, মুখের বিকৃতাস্বাদ, মলের কাঠিন্য, পেটে বেদনা পায়ে ঝিন্‌ঝিনি লাগা, পিণ্ডিকোদ্বেষ্টন, সন্ধির যোড় যেন খুলিয়া গিয়াছে বোধ করা, উরু-দেশের অবসন্নতা, চুয়াল চাপিয়া ধর', কাণে শব্দ, কপাল বেদনা, মুখের কষায় আস্বাদ, পিপাসা কাঠউকি, শুষ্ক কাশি, ঢেকুর না উঠা, অবিপাক, ভ্রম, প্রলাপ, রোমহর্ষ, দন্তহর্ষ, পেটফাঁপা হাইউঠা ও উষ্ণাভিপ্রায়তা অর্থাৎ গরম ভাল লাগা, বাতজ্বরের লক্ষণ। বাতজ্বর আসিবার ও বাড়িবার সময়—ভুক্তবস্তু জীর্ণ হইবার পর, দিনের শেষ ও বর্ষাকাল।

পিত্তজ্বরের নিদান ও লক্ষণ।

কটু, লবণ, অম্ল, ক্ষার অতিভোজন, অজীর্ণে ভোজন, তীব্র রৌদ্র তাপ, অগ্নি সন্তাপ, অতিমাত্রায়, অল্পমাত্রায় কিম্বা অসময়ে ভোজন ও অতিশ্রম পিত্তজ্বরের বিশেষ কারণ। জ্বরের বেগ প্রবল, তরল দাস্ত, অল্প নিদ্রা, বমন, কোন অঙ্গে ফোড়া হইবার সময় যেমন বেদনা হয় রোগীর কণ্ঠে, ওষ্ঠে, নাকে ও মুখে সেইরূপ বেদনা, ঘর্ম্ম নির্গম, অসম্বদ্ধ বাক্য, মুখ তিক্ত, মূর্চ্ছা, গাত্রদাহ, মদ (অল্পভাবে মূর্চ্ছা) তৃষ্ণা, ভ্রম (গা ঘোরা), মল, মূত্র ও চক্ষুর বর্ণ পীত হইয়া থাকে। অপিচ রোগী শীতল আহার আচরণ ভালবাসে, থুথুর সহিত রক্ত বাহির হয়, গায়ে লালবর্ণ বোলতা কামড়ানর দাগের মত চিহ্ন প্রকাশ পায়, নিঃশ্বাসের বিকৃতি গন্ধ ও ভুক্ত বস্তুর অম্লপাক—পিত্তজ্বরের লক্ষণ।

কফজ্বরের নিদান ও লক্ষণ।

অধিক পরিমাণে ঘৃত, তৈলাদিযুক্ত বস্তু কিংবা গুরু, মধুর পিচ্ছিল, শীত (ঠাণ্ডা) অম্ল ও লবণ রস সেবন ও পরিশ্রম না করা কফজ্বরের বিশেষ কারণ।

রোগী মনে করে গায়ে যেন ভিজা কাপড় জড়ান আছে, জ্বরের মৃদুবেগ, কাজ করিবার শক্তি আছে কিন্তু উৎসাহ নাই, মুখের মিষ্ট আস্বাদ, প্রস্রাব জলের মত শাদা, মল শাদা রঙের, গায়ের জড়তা, কিছু না খাইলেও রোগী মনে করে যেন কত খাইয়াছি, সর্ব্বাঙ্গ বিশেষতঃ মাথ

ও কোমর ভার, শীত বোধ, বমি বমিভাব, রোমাঞ্চ (গা কাঁটা দেওয়া), ঘুম খুব বেশী, নাক হইতে জলের মত শ্লেষ্মা স্রাব, কাসি, মুখে জল উঠা, আহারে অনিচ্ছা, চক্ষুর রঙ্ শাদা, এই গুলি কফজ্বরের লক্ষণ।

দ্বন্দ্ব জ্বর।

দ্বন্দ্ব শব্দের অর্থ দুই—দুইটী দোষ কর্ত্তৃক (যেমন বাতপিত্ত, পিত্তশ্লেষ্ম, বাতশ্লেষ্ম) আরব্ধ জ্বরকে দ্বন্দ্বজ্বর বলে। এখন সন্দেহ হইতে পারে যে, বাত, পিত্ত ও কফ জ্বরের লক্ষণ বলিয়া আবার দ্বন্দ্বজ বাতপিত্তাদি জ্বরের লক্ষণ পৃথক্ বলিবার প্রয়োজন কি? কারণ বাতজ্বরের ও পিত্তজ্বরের লক্ষণ একত্র করিলেই ত বাতপিত্তজ্বরের লক্ষণ হইবে। সর্ব্বত্র এইরূপ হয় না। কেবল জ্বর বলিয়া নহে সমস্ত দ্বন্দ্বজ রোগেরই লক্ষণ দুই প্রকারের দেখা যায়—প্রকৃতি-সম-সমবায়ারব্ধ ও বিকৃতি-বিষম-সমবায়ারব্ধ। জ্বর রোগকে উদাহরণ স্বরূপ লইয়া বুঝাইতেছি—বাতজ্বরের যে যে লক্ষণ ও পিত্তজ্বরের যে যে লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে, যে বাতপিত্তজ্বরে কেবল সেইগুলিই প্রকাশ পায়—অতিরিক্ত কোন লক্ষণই দেখা যায় না, সেই বাতপিত্ত জ্বরকে প্রকৃতিসমসমবায়ারব্ধ বলে, কেননা এখানে কারণের (বাতপিত্তের) অনুরূপ অর্থাৎ সমান কার্য্য (লক্ষণ) হইল। শাস্ত্রকারগণ প্রায়ই এই প্রকৃতিসমসমবায়ারব্ধ দ্বন্দ্বজ রোগের লক্ষণ বলেন না। কেননা—প্রত্যেকের লক্ষণ জানা থাকিলে এইরূপ দ্বন্দ্বজ রোগের লক্ষণ না বলিলেও বুঝা যায়। কচিৎ অতিদেশে উল্লেখ করিয়া থাকেন। যেমন চরক বলিয়াছেন—

নিদানে ত্রিবিধা প্রোক্তা যা যা পৃথগ্‌জ্বরাকৃতিঃ।
সংসর্গসন্নিপাতানাং তথা চোক্তং স্বলক্ষণম্।

নিদানে বাতজ পিত্তজ কফজ জ্বরের যে যে লক্ষণ বলিয়াছি সেই সমস্ত লক্ষণের সমাবেশেই দ্বন্দ্বজ ও সান্নিপাতিক জ্বরের লক্ষণ বুঝিবে। সমস্ত দ্বন্দ্বজ রোগের এমন কতকগুলি লক্ষণ প্রকাশ পায় যাহাদের কতকগুলি, ঐ দ্বন্দ্বজ রোগটী যে দুইটী দোষ দ্বারা আরব্ধ উহাদের লক্ষণ এবং কোনটী বা কতকগুলি উহাদের কাহারও লক্ষণ নহে। এই প্রকার দ্বন্দ্বজ রোগকে বিকৃতিবিষম-সমবায়ারব্ধ বলে। উদাহরণ দিতেছি। আমরা পরে যে বাতপিত্ত জ্বরের লক্ষণ বলিব তাহাতে অন্যান্য লক্ষণের সহিত অরুচি ও রোমহর্ষ এই দুইটী লক্ষণ আছে। কিন্তু এই অরুচি বা রোমাঞ্চ বাতজ্বর বা পিত্তজ্বর কাহারই লক্ষণ নহে। বাতশ্লেষ্ম জ্বরের লক্ষণের মধ্যে 'সন্তাপ' আছে কিন্তু এই সন্তাপ বাতজ্বর বা শ্লেষ্মজ্বর কোনটীরই লক্ষণ নহে। বিকৃতিবিষমসমবায়ারব্ধ শব্দের অর্থ কারণের অননুরূপ কার্য্য। এস্থলে বাতপিত্ত জ্বরে, কারণের (বাতপিত্তের) অননুরূপ অর্থাৎ অসমান কার্য্য (অরুচি, রোমাঞ্চ) হইল। পরে যে সকল দ্বন্দ্বজ ও সন্নিপাত জ্বরের উল্লেখ করা হইবে সে সমস্তই বিকৃতি-বিষমসমবায়ারব্ধ জানিবে।

বাতপিত্ত জ্বরের লক্ষণ—পিপাসা, অজ্ঞান হওয়া, গা ঘোরা, গা জ্বালা, নিদ্রানাশ, মাথায় বেদনা, গলা মুখ শুকাইয়া যায়, রোমাঞ্চ, আহারে অনিচ্ছা, চক্ষুতে অন্ধকার দর্শন, হাতের পায়ের হাড়ে সূচ ফোঁটার মত বেদনা, অধিক কথা বলা, ও হাইউঠা।

চৈত্রের সূচী।

"আয়ুর্ব্বেদের" নিয়মাবলী।

১। আয়ুর্ব্বেদের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা, ডাক মাশুল ।৵০ আনা; আশ্বিন হইতে বর্ষারম্ভ। যিনি যে কোন সময়েই গ্রাহক হউন, সকলকেই আশ্বিন হইতে কাগজ লইতে হইবে। টাকাকড়ি কবিরাজ শ্রীযামিনীভূষণ রায় কবিরত্ন এম-এ, এম-বি, ৪৬নং বিডন্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

২। মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে "আয়ুর্ব্বেদ" প্রকাশিত হয়। যে মাসের কাগজ সেই মাসেরমধ্যে না পাইলে সংবাদ দিতে হয়। অন্যথা ঐ সংখ্যা পৃথক্ মূল্য দিয়া লইতে হইবে।

৩। প্রবন্ধ লেখকগণ কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিবেন। যে সকল প্রবন্ধ মুদ্রণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত না হয়, সাধারণতঃ সেগুলি নষ্ট করা হইয়া থাকে, তবে লেখক যদি প্রত্যর্পণ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন এবং পুনঃ প্রেরণের টিকিট পাঠান, তাহা হইলে অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ পাঠান হইয়া থাকে।

৪। গ্রাহকগণ ঠিকানা পরিবর্ত্তনের সংবাদ যথাসময়ে জানাইবেন, নতুবা অপ্রাপ্ত সংখ্যার জন্য আমরা দায়ী হইব না। "আয়ুর্ব্বেদ" সম্বন্ধে কোন বিষয় জানাইতে হইলে অনুগ্রহপূর্ব্বক গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিবেন নচেৎ কাজের বড়ই অসুবিধা হয়।

৫। রীপ্লাই কার্ড কিম্বা টিকিট না দিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না।

৬। বিজ্ঞাপনের হার—

মাসিক	এক পৃষ্ঠা	বা	দুই কলম	৮৲
,,	আধ ,,	,,	এক ,,	৪৷৷০
,,	সিকি ,,	,,	আধ ,,	২৸০
,,	অষ্টাংশ ,,	,,	সিকি ,,	১৷৷০

বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দিতে হয়, এক বৎসরের মূল্য অগ্রিম দিলে টাকায় এক আনা কম লওয়া হয়। পত্র ও প্রবন্ধাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কবিরাজ শ্রীহরিপ্রসন্ন রায় কবিরত্ন
"আয়ুর্ব্বেদ" কার্য্যাধ্যক্ষ
২৯নং ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

২৯, ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট্, অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় হইতে শ্রীহরিপ্রসন্ন রায় কবিরত্ন দ্বারা প্রকাশিত ও ১৬১ নং মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট্, গোবর্দ্ধন মেসিন্ প্রেস হইতে শ্রীহরিপ্রসন্ন রায় কবিরত্ন দ্বারা মুদ্রিত।

আয়ুর্ব্বেদ

মাসিক পত্র ও সমালোচক

সম্পাদক—

কবিরাজ—শ্রীবিরজা চরণ গুপ্ত কবিভূষণ

শ্রীযামিনী ভূষণ রায় কবিরত্ন

এম.এ, এম.বি।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা, মাশুল।৵৹
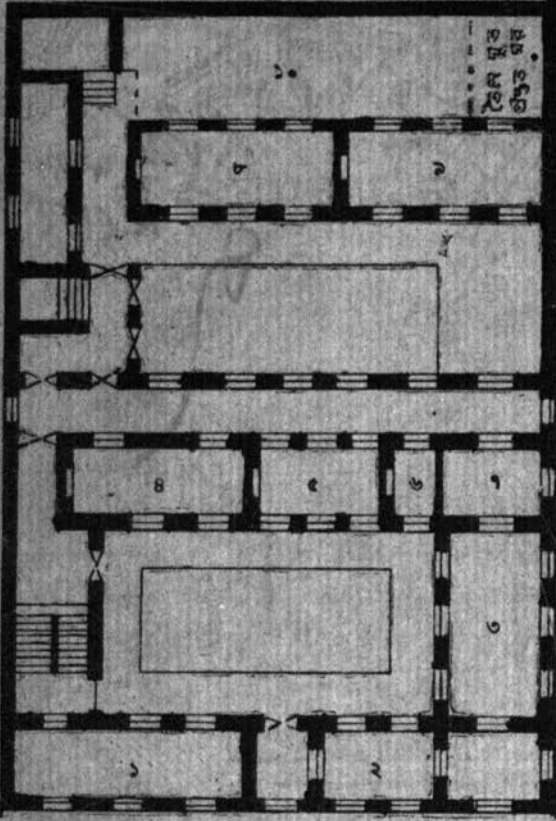
প্রতি সংখ্যার মূল্য।৹

"অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়"

২৯, ফড়িয়া পুকুর ষ্ট্রীট,—কলিকাতা।

এক তলা

১। কায়চিকিৎসা বিভাগ।

২। শল্যচিকিৎসা বিভাগ।

৩। ঔষধালয়।

৪। বিকৃত শারীরদ্রব্য সম্ভার।

৫। ভেষজপরিচয়াগার।

৬। আফিস ঘর।

৭। ভেষজ ভাণ্ডার।

৮। শারীর পরিচয়াগার।

৯। রসশালা।

১০। বৃক্ষবাটিকা।

দো-তলা
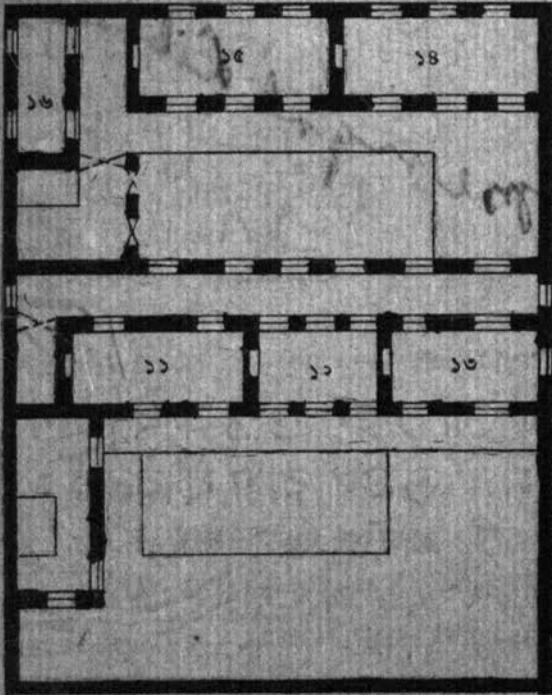
১১—১৩। পাঠাগার।

১৪। গবেষণা মন্দির ও যন্ত্রশস্ত্রাগার।

১৫। অধ্যাপক সম্মেলন ও গ্রন্থাগার।

১৬। ঠাকুর ঘর।

মাসিকপত্র ও সমালোচক।

১ম বর্ষ। বঙ্গাব্দ ১৩২৪—জ্যৈষ্ঠ। ৯ম সংখ্যা।

আয়ুর্ব্বেদের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা।

(ঢাকা নগরীতে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় বৈদ্য-সম্মেলনে পঠিত।)

পূর্ণ-সৎ-চিৎ—আনন্দময়, বেদবক্তা দেবদেবেশ জগদীশ্বরের সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ চরণোদ্দেশে কোটি কোটি প্রণাম করিয়া, গুরুজনের চরণোদ্দেশে প্রণাম করিয়া, সমবেত সভ্য মহোদয় গণকে যথাযোগ্য প্রণাম, অভিবাদন ও অভিনন্দন করিয়া, আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য নিবেদন করিতেছি।

সমবেতসভ্য মহোদয়গণ, বহুদিনের সুপ্ত ভারত আজ আবার জাগিয়া উঠিয়াছে। স্বপ্নে জীব যেমন বাস্তব পদার্থকে অবাস্তব এবং অবাস্তব পদার্থকে বাস্তব দেখে, ভারত স্বপ্নযোগে এতদিন তাহাই দেখিতেছিল। স্বকীয় ভাণ্ডারের কাঞ্চনকে কাচ মনে করিয়া ভারত এতদিন পরকীয় ভাণ্ডারের কাচকে কাঞ্চন জ্ঞান করিতেছিল। এতদিনে সে স্বপ্ন টুটিয়াছে—সে ভ্রম ঘুচিয়াছে। কিন্তু এই এতদিনের সুপ্ততা—এতদিনের ভ্রম, আয়ুর্ব্বেদের যে কি অনিষ্ট করিয়াছে, তাহা কেমন করিয়া বুঝাইব। বুঝাইবার ভাষা জগতে আজিও সৃষ্টি হয় নাই। জগতের যাবতীয় চিকিৎসা শাস্ত্রের সম্রাট্ আয়ুর্ব্বেদ, আজ সর্ব্বস্বান্ত দীনহীন ভিখারী। কোটি কোটি প্রাণীর দেহ যাহার অনুগ্রহে রক্ষিত হইত, সে আজ স্বীয় দেহ রক্ষার জন্য পরের দ্বারস্থ। যাহার জ্ঞানালোকে একদিন জগৎ উদ্ভাসিত হইয়াছিল, সে আজ ঘোরতর অজ্ঞান তমসাচ্ছন্ন। এ দুঃখ প্রকাশের কি ভাষা আছে।

একথা কেন বলিতেছি? আজ এই সুখের দিনে—বঙ্গের বৈদ্য সম্প্রদায়ের এই প্রান্ত সম্মিলনের দিনে, হৃদয় সুখে পরিপ্লুত না হইয়া দুঃখে অভিভূত হয় কেন? হয়—আমরা পুণ্যময়, অনাদি, জগতের যাবতীয় চিকিৎসা শাস্ত্রের জনক আয়ুর্ব্বেদকে তাচ্ছিল্য করিয়াছি বলিয়া, লোভে স্বার্থপরতায় অন্ধ হইয়া আমারা সর্ব্বভূতহিতে রত আয়ুর্ব্বেদকে নষ্ট প্রায় করিয়াছি বলিয়া, অবহেলায় আমরা এই জীবের জীবন শাস্ত্রকে কঙ্কালসার করিয়া তুলিয়াছি বলিয়া।

যে আয়ুর্ব্বেদের অষ্ট মহাশাখা, অসংখ্য প্রশাখা ফলপল্লবকুসুম সমৃদ্ধ হইয়া ভারতে কল্পতরু রূপে অধিষ্ঠিত ছিল, যাহার আশ্রয়ে থাকিয়া প্রাচীন ভারতবাসী জ্ঞান, বিদ্যা, বুদ্ধি, মেধা, প্রতিভা ও শৌর্য্যেবীর্য্যে জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল, যে আয়ুর্ব্বেদের অমৃতময় ফললাভের আকাঙ্ক্ষায় দেশদেশান্তর হইতে বিবিধ জাতি ভিক্ষুকরূপে ভারতে আসিয়াছিল, সেই মহামহিমমণ্ডিত আয়ুর্ব্বেদের অবস্থা এক্ষণে কিরূপ? বলিতে কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া যায়, অশ্রু দৃষ্টিরোধ করে, হৃদয় শতধা বিচ্ছিন্ন হইতে চায়—সে আয়ুর্ব্বেদ আর নাই, আছে কেবল তাহার অঙ্গহীন কঙ্কাল মাত্র। আয়ুর্ব্বেদ মহাতরু আজ বজ্রাহতবৎ বিশীর্ণ। সে অষ্টমহাশাখা নাই, প্রশাখা নাই, ফলপল্লব কুসুম নাই—কেবল দুই একটা শীর্ণশাখা কোনও রূপে জীবিত রহিয়াছে মাত্র।

একটি অপ্রিয় সত্যকথা বলিতেছি। দেখুন আমাদের আয়ুর্ব্বেদে চিকিৎসকের যে আদর্শ অঙ্কিত দেখিতে পাই সেই আদর্শের শল্যচিকিৎসক এমন কি কায়-চিকিৎসকও এক্ষণে আমরা ভারতে দেখিতে পাইতেছি না। আদর্শ চিকিৎসক ত দূরের কথা তাঁহাদের যোগ্য শিষ্য বলিয়া গণ্য হইবার অধিকারীই বা কয়জন আছেন? এই অবনতি কেন হইল ভাবিয়াছেন কি? এই জিজ্ঞাসার অনেক উত্তর দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু আমার বোধ হয়

প্রধান ও প্রথম কারণ—শাস্ত্র-বিরুদ্ধ অধ্যাপনা প্রণালী।

দেশে এখন যে প্রণালীতে আয়ুর্ব্বেদের অধ্যাপনা হইতেছে তাহা সম্পূর্ণ আর্ষমত বিরুদ্ধ। আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যার্থীর শিক্ষিতব্য বিষয় অতি সংক্ষেপে বলিতে গেলে তিনটী—রোগীর জ্ঞান, রোগের জ্ঞান এবং ঔষধের জ্ঞান। রোগীর শরীরে রোগ, আমাকে তাহার চিকিৎসা করিতে হইবে, সুতরাং রোগীর শরীরটী আমার ভাল করিয়া জানা আবশ্যক। এই জ্ঞান লাভের জন্য যে নরশরীরের রোগের চিকিৎসা করিতে হইবে সেই নরদেহচ্ছেদ করিয়া ধাতু আশয়াদির নিঃসংশয় জ্ঞান লাভ করিতে হইবে—ইহাই আয়ুর্ব্বেদ বক্তা ঋষির উপদেশ। কিন্তু আমরা আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যার্থিগণকে শারীরতত্ত্ব এইরূপে শিক্ষা না দিয়া কাব্যের মত আবৃত্তি করাইতেছি। তারপর রোগের জ্ঞান—রোগের জ্ঞানলাভ বিষয়ক পূর্ণ উপদেশ দিতে হইলে শাস্ত্র এবং প্রত্যক্ষ দর্শন দুইই প্রয়োজন। রোগজ্ঞান শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে আমরা অল্পমেধা ভিষগ্বর্গের জন্য অতি স্থূলভাবে সংগৃহীত সেই মাধবনিদান ভিন্ন আর কিছুই পড়াই না। মাধবনিদানে উল্লিখিত হয় নাই এমন অনেক সুভাষিত আকরগ্রন্থে বিদ্যমান রহিয়াছে, যাহা বিদ্যার্থিগণের অবশ্য পাঠ্য। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, আজ পর্য্যন্ত ঐ সকল অনুক্ত সুভাষিত সংগ্রহ ও উপদেশের আকাঙ্ক্ষা কোন আয়ুর্ব্বেদ অধ্যাপকেরই হৃদয়ে জাগ্রত হইল না। বিজয় রক্ষিত বুঝিয়াছিলেন যে, মাধবে উপযুক্ত বিষয় অনুক্ত হইয়াছে, কিন্তু তিনি সেই অনুক্তের উল্লেখ কেবল গ্রন্থ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন মাত্র—প্রপূর্ত্তির অভিপ্রায়ে বলেন নাই। ইহা ত হইল গ্রন্থের কথা—প্রত্যক্ষ দর্শনের বিশেষ ব্যবস্থা কিছুই নাই। রোগের লক্ষণ শাস্ত্রে পড়িলেই যথেষ্ট হইল না, রোগীর শরীরে ঐ রোগ লক্ষণ প্রত্যক্ষ করিবার উপদেশ আছে। কিন্তু দেশে "আতুরাশ্রম" (In door Hospital) না থাকায় বিদ্যার্থিগণের সে শিক্ষা হইতেছে না। অধ্যাপকের গৃহে সমাগত রোগী দেখিয়া বিদ্যার্থিগণের

এই জ্ঞান সম্যক্ লাভ করা কেন সম্ভব নহে তাহা ভুক্তভোগী জানেন। অতঃপর ঔষধের জ্ঞানের কথা—ঔষধ শব্দে ঔষধের উপাদানের পরিচয়, গুণ, যোজনা ও ঔষধ নির্ম্মাণের জ্ঞান বুঝিতে হইবে। কিন্তু আমাদের আয়ুর্ব্বেদাধ্যাপকগণের গৃহে বিবিধ ভেষজ দ্রব্য সংগৃহীত না থাকায় এবং দেশে বৈদ্যক বৃক্ষ-বাটিকার অভাব হেতু, দ্রব্যদর্শন করাইয়া দ্রব্যগুণের অধ্যাপনার পরিবর্ত্তে কাব্যের মত দ্রব্যগুণের শ্লোক ছাত্রেরা আবৃত্তি করিতেছে। ইহার ফলে অনেক মহার্ঘ দ্রব্য একবারে অপরিচিত হইয়া পড়িয়াছে, অনেকের পরিচয়ে ঘোরতর সন্দেহ জন্মিয়াছে, কতকগুলি দ্রব্যকে নানালোকে নানানামে ব্যবহার করিতেছে। অধ্যাপনার দোষে ঔষধ নির্ম্মাণের জ্ঞানও ক্রমশঃ খর্ব্বতা প্রাপ্ত হইতেছে। দেশে রীতিমত "রসশালা" প্রতিষ্ঠিত না থাকায় পাকযন্ত্র ও রসৌষধ নির্ম্মাণের পটুতা প্রায় লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছে। আমার কোন বন্ধু কবিরাজ সেদিন বলিতেছিলেন তাঁহার নিকট কএক বৎসর থাকিয়া কোন ছাত্র দেশে গিয়া তাঁহাকে কজ্জলীর জায় চাহিয়াছিল—অবস্থা ত এই। আয়ুঃশাস্ত্র-বক্তা ঋষিগণের উপদেশ মতে যদি আমরা, নরশরীরে প্রত্যক্ষ দর্শন পূর্ব্বক শারীর জ্ঞান, রোগি-শরীরে প্রত্যক্ষদর্শন পূর্ব্বক রোগবিনিশ্চয় এবং দ্রব্য-প্রদর্শন পূর্ব্বক দ্রব্যগুণের অধ্যাপনা করাইতাম, তাহা হইলে আজ আমাদের এই ব্রীড়াজনক দুরবস্থা উপস্থিত হইত না।

অবনতির দ্বিতীয় কারণ—গ্রন্থলোপ।

মহর্ষি আত্রেয়ের শিষ্যগণের প্রত্যেকেই এক একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু এক চরকসংহিতা ভিন্ন আত্রেয় সম্প্রদায়ের আর কোন গ্রন্থই আমরা দেখিতে পাইতেছি না। ভগবান্ ধন্বন্তরির বারজন শিষ্য, বারখানি গ্রন্থরচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু এক সুশ্রুতসংহিতা ভিন্ন ধন্বন্তরিসম্প্রদায়ের আর কোন গ্রন্থই আমরা পাইতেছি না। তারপর এক সুশ্রুতসংহিতারই কত ভাষ্য, টিপ্পনী, টীকা রচিত হইয়াছিল। এগুলির কেবল নাম মাত্র আমরা শ্রুত আছি। চরকসংহিতার দ্বাদশজন টীকাকারের নাম আমরা জানিতে পারিতেছি, কিন্তু অধুনা কেবল চক্রপাণির টীকা মাত্র পাওয়া যায়, তাহাও প্রায় খণ্ডিত। ইহা ভিন্ন গজ, অশ্ব, বৃক্ষ প্রভৃতির পালন ও চিকিৎসা বিষয়ে কত গ্রন্থই রচিত হইয়াছিল। কত নিঘণ্টু, "দ্রব্যচিহ্নের" মত কত দ্রব্য পরিচায়ক গ্রন্থ, কত প্রাণিবিষয়ক পুস্তক, কত সূদশাস্ত্র, কত গন্ধশাস্ত্র, কত মদিরাসব প্রস্তুত বিষয়ক গ্রন্থ ও কত যে ধাতু-মণি-রত্নাদি পরীক্ষার পুস্তক রচিত হইয়াছিল এক্ষণে তাহার সংখ্যা করা অসম্ভব। গ্রন্থ জ্ঞানের ভাণ্ডার—গ্রন্থলোপে অজ্ঞানতার প্রসার অবশ্যম্ভাবী।

তৃতীয় কারণ—অযোগ্য-বিদ্যার্থী।

অধ্যাপক সুযোগ্য হইলে এবং অধ্যাপনার প্রণালী উৎকৃষ্টতর হইলেও যোগ্য পাত্রে যদি উপদেশ প্রদত্ত না হয়, তাহা হইলে ফল লাভের সম্ভাবনা কোথায়? সুতরাং কেবল অধ্যাপক বা অধ্যাপনা প্রণালীর দোষের প্রতীকার করিলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না, ছাত্রের যোগ্যতার প্রতিও বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। রীতিমত সংস্কৃতজ্ঞ ছাত্র না হইলে আয়ুর্ব্বেদ সম্যক্

রূপে আয়ত্ত করা সম্ভবপর নহে। কিন্তু এক্ষণে যে সকল ছাত্র আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করে তাহাদের মধ্যে শতকরা একটী ছাত্র ব্যাকরণ, কাব্য ও দর্শন শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন কি না সন্দেহ।

পূর্ব্বে ব্রহ্মচর্য্য পালন এবং গুরুগৃহে বাস করিয়া যেরূপ নিয়মে বিদ্যাশিক্ষা করিবার রীতি ছিল, এখন আর সেরূপ প্রথা নাই। ছাত্রগণ ব্রহ্মচর্য্য পালন করে না এবং বিদ্যা-গ্রহণান্ত কাল পর্য্যন্ত গুরুগৃহে বাস করে না। যে ছাত্র বৎসরে তিন মাস গুরুগৃহে বাস করে, সে নয় মাস কাল স্বগৃহে অবস্থান করিয়া থাকে। এরূপ অবস্থানও স্বল্পকালের জন্য। ভগবান্ মনু ছত্রিশ বৎসর, অষ্টাদশ বৎসর, নয় বৎসর বা গ্রহণান্তিক কাল পর্য্যন্ত গুরুগৃহ বাসের সময় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু এক্ষণে ছত্রিশ বৎসর স্থলে ছত্রিশ মাস, অষ্টাদশ বৎসর স্থলে অষ্টাদশ মাস, নয় বৎসর স্থলে নয় মাসও গুরুগৃহে অবস্থান করা হয় কিনা সন্দেহ! এইরূপ প্রথা বশতঃ ছাত্রদিগের আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। ব্রহ্মচর্য্য পালন ব্যতীত বুদ্ধি মেধার প্রাখর্য্য সাধিত হইতে পারে না এবং বুদ্ধি ও মেধার প্রখরতা ব্যতীত শাস্ত্রার্থে ব্যুৎপত্তি লাভ করা যায় না। এই জন্য আমাদিগকে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। আমাদের বাল্য বিবাহের দেশে অল্প বয়সে বিবাহ অনেক সময় অনিবার্য্য হইলেও বিবাহের পর গুরুগৃহে নিয়ত অবস্থান করিলে ব্রহ্মচর্য্যের কোনরূপ ব্যাঘাত ঘটিবার সম্ভাবনা নাই।

প্রকৃত পক্ষে আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি করিতে হইলে আমাদের কিরূপ উপায় অবলম্বন করা উচিত—এক্ষণে সেই বিষয় আলোচনা করা যাইতেছে।

১। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা

দেখিতেছি সংপ্রতি অনেক সুযোগ্য অধ্যাপক অন্নদান করিয়া ছাত্র রাখিতে অক্ষম, আবার অনেক অধ্যাপক কর্ম্মাতিব্যস্ত বলিয়া ছাত্রদিগের নিকট শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিবার অবসর প্রাপ্ত হন না। যোগ্যাকরণপূর্ব্বক অধ্যাপনার উপকরণ রাশি কাহারই গৃহে সম্যক্ সংগৃহীত নাই। যে সকল কর্ম্মাতিব্যস্ত চিকিৎসকের সমগ্র আয়ুর্ব্বেদ অধ্যাপনার অবকাশ নাই, তাঁহারা সুবিধা-মত কিঞ্চিৎ মাত্র সময়ক্ষেপ করিয়া এবং যাঁহাদের অবকাশ আছে তাঁহারা প্রচুর সময়ক্ষেপ করিয়া যদি যোগ্যাকরণ সহকারে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের অধ্যাপনা করেন, তাহা হইলে দেশে আর বিজ্ঞ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকের অভাব থাকে না। কিন্তু বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ভিন্ন এবম্বিধ সম্মেলন নির্ব্বাহ হইতে পারে না। সুতরাং এক্ষণে দেশে আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে।

২। ছাত্র নির্ব্বাচন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছাত্র যথেষ্ট পাওয়া যায় না। তবে উপায় কি? আমাদের মতে সংপ্রতি দেশে যাহা আছে তাহা লইয়াই কাজ করিতে হইবে এবং ভবিষ্যতে যাহাতে অভিপ্রেত উচ্চ আদর্শের চিকিৎসক প্রস্তুত হইতে পারে, তাহার জন্য আন্তরিক চেষ্টা করিতে হইবে। ইহাই প্রকৃত হিতৈষী কর্ম্মি পুরুষের পন্থা। যখন কলিকাতায় মেডিকেল কালেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তখন যদি প্রতিষ্ঠাতৃগণ ইংরাজি ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছাত্র না হইলে পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করাইবেন না—এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতেন, তাহা হইলে কি এদেশে পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিদ্যার এতশীঘ্র এতাদৃশ প্রচার

হইত। দেশের অবস্থানুসারে তখন তাঁহারা বাঙ্গালা ভাষায় শিক্ষা দিয়াছিলেন বলিয়াই এখন তাঁহারা এত অভিমত, যোগ্য, ব্যুৎপন্ন ছাত্র পাইতেছেন যে স্থান, সঙ্কুলান হয় না। আমাদিগকেও বর্ত্তমানে এই পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে। যতদিন দেশে সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন, বহুসংখ্যক ছাত্র না পাওয়া যাইতেছে, ততদিন বাঙ্গালা ভাষা শুদ্ধ করিয়া পড়িতে লিখিতে পারে এরূপ ছাত্র লইয়া তাহাদিগকে বাঙ্গালা ভাষায় শিক্ষা দিতে হইবে।

৩। যোগ্যাকরণ—শব ব্যবচ্ছেদাদি।

প্রত্যক্ষদর্শন ও শাস্ত্রদর্শন এই দুইয়ের মিলনেই জ্ঞানবর্দ্ধিত হয়। এই উপদেশটী স্মরণ রাখিয়া শিক্ষা দিতে হইবে। শবব্যবচ্ছেদ চিকিৎসক মাত্রেরই বিশেষতঃ শল্য চিকিৎসকগণের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। শব ব্যবচ্ছেদ করিয়া প্রত্যক্ষ দর্শনমূলক জ্ঞান লাভ করিতে না পারিলে চিকিৎসায় বিশেষতঃ শল্য চিকিৎসায় নিপুণতা লাভ করিবার অন্য উপায় নাই। সেই জন্য বিদ্যালয়ে শবব্যবচ্ছেদের ব্যবস্থা করিতে হইবে। কিন্তু কাজের সুবিধার জন্য এ সম্বন্ধে প্রাচীন মতের অনুবর্ত্তন না করিয়া বর্ত্তমান প্রণালীর অনুসরণ করা কর্ত্তব্য।

৪। গ্রন্থাগার।

পূর্ব্বে বিবিধ আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থের প্রচার ছিল। এই গ্রন্থরাশি কি বাস্তবিকই বিলোপ প্রাপ্ত হইয়াছে? কি করিয়া এ প্রশ্নের উত্তর দিব। অদ্যাপি বৈদ্যক গ্রন্থ অনুসন্ধানের জন্য ভারতবর্ষব্যাপী কোন আন্তরিক প্রযত্ন অনুষ্ঠিত হয় নাই। দেশের যে যে স্থানে প্রাচীন গ্রন্থরাশি অদ্যাপি সযত্নে রক্ষিত রহিয়াছে, সেই সকল স্থান তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ করা হয় নাই। সাহিত্য পরিষদের চেষ্টার পূর্ব্বে কে জানিত বাঙ্গলা ভাষায় এত বিচিত্র গ্রন্থরাশি আছে? সুতরাং সংস্কৃতজ্ঞ ভ্রমণকারী পণ্ডিত নিয়োগ করিয়া ভারতের ভিন্ন ভিন্ন দেশে সংস্কৃত বৈদ্যক গ্রন্থের অনুসন্ধান করা এবং প্রাপ্তগ্রন্থ বা তৎপ্রতি-লিপি সংগ্রহ ও মুদ্রিত করিয়া প্রচার করা আবশ্যক।

৫। বৈদ্যক বৃক্ষ-বাটিকা।

যোদ্ধার যেমন অস্ত্র প্রয়োগ কৌশল জানা আবশ্যক, চিকিৎসকেরও তদ্রূপ দ্রব্য-যোজনা-কুশল হওয়া প্রয়োজন। দ্রব্য প্রয়োগ করিতে হইলে দ্রব্যের পরিচয় আবশ্যক। দ্রব্যের পরিচয় আবার দ্রব্যের প্রত্যক্ষ-দর্শন-মূলক, প্রত্যক্ষদর্শন জন্য আবার দ্রব্যের একত্র সমাবেশ আবশ্যক। সুতরাং বৈদ্যকবৃক্ষ-বাটিকা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা সিদ্ধ হইতেছে।

ভারতের চিকিৎসা-শাস্ত্র আয়ুর্ব্বেদ মহার্হ ভৈষজ্য-রত্নে পরিপূর্ণ। অন্য কোন দেশের চিকিৎসা-শাস্ত্র এরূপ ভৈষজ্য-সম্পদের স্পর্দ্ধা করিতে পারে না। কেবল দেশীয় ঔষধের গুণে কত অনভিজ্ঞ লোকও কত দুরারোগ্য ব্যাধির প্রতীকার করিতেছে, ইহা আমরা নিয়ত প্রত্যক্ষ করিতেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা দিন দিন কত মহোপকারী দ্রব্য হারাইতেছি। চরক সুশ্রুতোক্ত সন্দিগ্ধ বা অপরিচিত দ্রব্যের কথা ছাড়িয়া দিলেও, ভাবপ্রকাশ বা চক্রসংগ্রহোক্ত কত দ্রব্যই ক্রমশঃ আমাদের অপরিচিত হইয়া পড়িতেছে। আমরা বলাডুমুরকে ত্রায়মাণা বলিয়া এবং কোন অজ্ঞাতনামা কাষ্ঠ বিশেষকে প্রপৌণ্ডরিক বলিয়া প্রয়োগ করিতেছি। আজকাল কৃষিকার্য্যের বিস্তার হেতু বৃক্ষ গুল্মাদির বিলোপ সাধিত হইতেছে। দ্রব্যলোপের সহিত দ্রব্যের অপরিচয় অবশ্যম্ভাবী। অতএব দ্রব্যের

লোপাপত্তি নিরাশার্থ বৈদ্যক-বৃক্ষবাটিকা প্রতিষ্ঠার নিতান্ত প্রয়োজন। কেবল দ্রব্যের লোপাপত্তি নিবারণ নহে, দ্রব্যের গুণোৎকর্ষের জন্যও উদ্যান-প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা আছে। আমরা অধুনা যে সমস্ত বৃক্ষ, লতা, গুল্মাদি ঔষধার্থ ব্যবহার করিতেছি দীর্ঘকাল আরণ্য উদ্ভিদের সহিত জীবনসংগ্রামে তাহারা হীনবীর্য্য হইয়া পড়িয়াছে। এই সকল হীনবীর্য্য ওষধি উদ্যানে সযত্ন-পালিত হইলে, তাহারা আবার তাহাদের পূর্ব্ববীর্য্য পুনঃ প্রাপ্ত হইবে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে উদ্ভিদ্ সংগ্রহ এবং সংগৃহীত উদ্ভিদ্‌গুলিকে তত্তৎ দেশের ভূমি, বায়ু ও প্রাকৃতিক অবস্থানুসারে রক্ষাপূর্ব্বক ভৈষজ্যোদ্যান প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

৬। দাতব্য চিকিৎসালয় ও রুগ্নাবাস স্থাপন।

চিকিৎসা শাস্ত্রের সজীবতা রক্ষা ও উন্নতি কল্পে যেমন সুচিকিৎসকের প্রয়োজন, দরিদ্র-দিগের উপকার, ছাত্রদিগের সুশিক্ষা ও চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রসারের জন্য সেইরূপ দাতব্য চিকিৎসালয় ও রুগ্নাবাস (Out-door and In-door Hospital) আবশ্যক। দাতব্য চিকিৎসালয় ও রুগ্নাবাস প্রতিষ্ঠা না করিলে ছাত্রদিগের কার্য্যতঃ চিকিৎসা কৌশল শিক্ষার দ্বিতীয় কোন উপায় নাই। কলিকাতা মেডিকেল কলেজে এইজন্য বহুব্যয় করিয়া দাতব্য চিকিৎসালয় ও রুগ্নাবাস স্থাপন করা হইয়াছে। এখন বলিতে কেমন সঙ্কোচ বোধ হয়, কিন্তু সুদূর ভবিষ্যতে মেডিকেল কলেজের ন্যায় আমাদের ও ধাত্রীবিদ্যা, চক্ষুঃ চিকিৎসা প্রভৃতি শিক্ষা দিবার জন্য স্বতন্ত্র বিভাগ প্রতিষ্ঠা করিবার আবশ্যক হইবে।

অধ্যাপনাগত অনর্থ পরম্পরার প্রতিকারের জন্য প্রায় একবৎসর হইল কলিকাতায় অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দাতব্য চিকিৎসালয়, রসশালা, ভেষজ পরিচয়াগার যন্ত্র শস্ত্রাগার, গ্রন্থাগার, গবেষণা মন্দির এবং ক্ষুদ্র বৃক্ষ-বাটিকা ইতি মধ্যেই স্থাপিত হইয়াছে। বহু সংখ্যক ছাত্র সুযোগ্য অধ্যাপকদিগের নিকট সুশিক্ষা লাভ করিতেছে। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে প্রত্যেক বঙ্গবাসীকে বিশেষতঃ প্রত্যেক চিকিৎসককে এই সুমহৎ মঙ্গলকর অনুষ্ঠানে যোগ দান করিতে অনুরোধ করি। সকলে একত্র মিলিয়া কার্য্য ক্ষেত্রে অগ্রসর হইলে আমাদের একের ত্রুটি অপরের দ্বারা শোধিত হইবে, একের অজ্ঞাত বিষয়ে অপরের নিকট উপদেশ পাওয়া যাইবে, একের পরিশ্রমের ফল অপরে লাভ করিবে, সকলের জ্ঞান মিলিত হইয়া সকলের হৃদয় আলোকিত করিবে। নব প্রতিষ্ঠিত এই শিশু বিদ্যালয়টীকে সম্পূর্ণাঙ্গ করিয়া আমরা ক্রমে বঙ্গের দেশে দেশে এইরূপ বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া আয়ুর্ব্বেদের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার করিব।

বর্ত্তমান যুগে আবার ভারতবাসী লুপ্তপ্রায় আয়ুর্ব্বেদের উদ্ধার কল্পে যত্নবান্ হইয়াছে। ভারতের মোহ নিদ্রা ভাঙ্গিয়াছে বলিয়া, বহুযুগের নিদ্রিত ভারতকে আবার জাগরিত দেখিয়া প্রাণে আশার সঞ্চার হয়, হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হয়। আয়ুর্ব্বেদের উন্নতিকল্পে এই যে ভারত ব্যাপী চেষ্টা—ইহার ফল একদিন অবশ্যই ফলিবে। কিন্তু এই মহান্ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ভারতীয় চিকিৎসক মণ্ডলীর একপ্রাণতা চাই, প্রাণপণ চেষ্টা চাই, সাধারণের

সহানুভূতি চাই, ভারত সম্রাট ও ভারতীয় রাজন্যবর্গের সহায়তা চাই। এই সকল প্রার্থনীয় বিষয়ের সংযোগ ঘটিলে আবার জীর্ণ শীর্ণ আয়ুর্ব্বেদ অষ্ট-শাখা-সমন্বিত মহাতরুতে পরিণত হইয়া ছায়া ও ফল দানে ভারতবাসীকে ধন্য করিয়া তুলিবে। আবার আমরা বিগত যুগের বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান, শৌর্য্য, বীর্য্য ফিরিয়া পাইব।

কিন্তু সাধনা চাই, একাগ্রতা চাই, শত শত জীবন উৎসর্গ করা চাই—তবে এই মহা সাধনায় সিদ্ধি লাভ হইবে। প্রাচীন কালে মহর্ষিগণ বহু সাধনার ফলে আয়ুর্ব্বেদকে মর্ত্তে আনিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। জগতের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, কোন জাতি কোন কালে কঠোর সাধনা ভিন্ন কোন বিষয়ে উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। আমাদের স্বার্থকে শবরূপে পরিণত করিয়া শবসাধনা করিতে হইবে। দ্বেষ, হিংসা, বিদ্রূপ কত মায়াময়ী বিভীষিকা দেখাইবে, তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করিলে চলিবে না।

হে সমবেত সুধীবৃন্দ, উপসংহারে বিনীত নিবেদন এই যে, আর কথায় নয় কাজে দেখাইতে হইবে। আয়ুর্ব্বেদ সম্মেলন নানা স্থানে অনেক হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ঐ সকল সভার উদ্দেশ্য, সিদ্ধির পথে কতদূর অগ্রসর হইয়াছে? চিরদিন কি আমরা এইরূপ বাক্যচ্ছটায় আয়ুর্ব্বেদের পুনরুদ্ধার করিব? সভাই কি চিরদিন আমাদের কর্ম্মক্ষেত্রে পরিণত হইবে? বাক্যের সময় আর নাই এখন কার্য্যের সময় আসিয়াছে। আসুন আমরা একযোগে কার্য্য ক্ষেত্রে অগ্রসর হই—অবশ্যই সিদ্ধি লাভ হইবে।

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়

২৯নং ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট্, শ্যামবাজার, কলিকাতা।

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের অধ্যাপনা যথাযথ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে নির্ব্বাহ করিবার জন্য বিদ্যালয়ে যে দ্রব্যরাশি সংগৃহীত হইয়াছে তদ্বিষয়ক স্থূল বিবরণ—

(ক) **রসশালায়**—ঔষধ নির্ম্মাণের বিবিধ যন্ত্র পাত্রাদি।

(খ) **ভেষজ পরিচয়াগারে**—৫০০ শতাধিক বণিক্ দ্রব্য, বিবিধ ধাতুপধাতু এবং ২০০ শতাধিক সজীব উদ্ভিদ্।

(গ) **যন্ত্রশস্ত্রাগারে**—শস্ত্রকর্ম্মোপযোগী বিবিধ যন্ত্রশস্ত্র।

(ঘ) **বিকৃত শারীর-দ্রব্যসম্ভারে**—পীড়া বিশেষে বিকৃতি প্রাপ্ত নব-শরীরের আশয়াদি।

(ঙ) **গবেষণামন্দিরে**—চিকিৎসা-বিজ্ঞানোচিত বিবিধ বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধান ও পরীক্ষার জন্য নানা উপকরণ এবং যন্ত্রাদি।

(চ) **শারীরপরিচয়াগারে**—নরকঙ্কাল, মানব অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সুরঞ্জিত চিত্র ও মৃত্তিকা-রচিত রঞ্জিত আশয়াদি সংগৃহীত হইয়াছে।

প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর অধ্যাপনা আরম্ভ হইয়াছে। অধ্যাপকগণের নাম—

কবিরাজ শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ কবীন্দ্র।

,, ,, যামিনীভূষণ রায় কবিরত্ন, এম, এ, এম, বি।

,, শ্রীযুক্ত অমিয় মাধব মল্লিক এম, বি,

,, ,, সুরেন্দ্র নাথ গোস্বামী বি, এ, এল্, এম্, এস্।

,, ,, বিরজাচরণ গুপ্ত কবিভূষণ।

,, ,, সুরেন্দ্রকুমার কাব্যতীর্থ।

,, বামাচরণ চট্টোপাধ্যায় এম, এ।

,, দ্বিজেন্দ্রকুমার মজুমদার এম, এ।

,, ভীমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী।

প্রথম বার্ষিক শ্রেণী।

বনৌষধি-বিজ্ঞান, দ্রব্যগুণ, রসশাস্ত্র, অঙ্গবিনিশ্চয়-বিদ্যা, শারীরবিজ্ঞান ও এই সকল অধীত অংশের যোগ্যাকরণ। দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে উন্নীতকরণের পরীক্ষা।

দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণী।

পরিভাষা ও রসরত্নাদি-তত্ত্ব, ঔষধ প্রস্তুত শিক্ষা, অঙ্গবিনিশ্চয়-বিদ্যা (তদ্বিস্তম্ভাষা [পাঠ চাওয়া] ও ব্যবচ্ছেদ পূর্ব্বক মৃতকপরীক্ষাসহ) শারীর-বিজ্ঞান, রোগবিনিশ্চয়। তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে উন্নীতকরণের পরীক্ষা।

তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণী।

দ্রব্যগুণ, ঔষধ প্রস্তুত শিক্ষা, রোগবিনিশ্চয়, কায়চিকিৎসা, শল্যতন্ত্র প্রসূতিতন্ত্র, (ধাত্রীবিদ্যা), আরোগ্যশালাকর্ম্মাভ্যাস, কৌমারভৃত্য। চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে উন্নীতকরণের পরীক্ষা।

চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণী।

কায়-চিকিৎসা, শল্যতন্ত্র, (যন্ত্রশস্ত্রকর্ম্মাভ্যাসসহ) শালাক্য-চিকিৎসা, উভয় তন্ত্রগত তদ্বিস্তম্ভাষা, ব্রণবন্ধন শিক্ষা, নাড়ীবিজ্ঞান, স্বস্থ-তত্ত্ব, অগদতন্ত্র, আরোগ্যশালাকর্ম্মাভ্যাস। সংস্কৃত বিভাগের বুৎপত্তিলাভের সাধারণ প্রশংসাপত্র ও বাঙ্গালা বিভাগের চরম পরীক্ষা।

পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণী।

নাড়ীবিজ্ঞানের বিশেষ আলোচনা, দ্বাদশমাস আরোগ্যশালাকর্ম্মাভ্যাস, কায়-চিকিৎসা ও শল্যশালাক্য তন্ত্রের প্রত্যক্ষদর্শনমূলক বৃদ্ধবৈদ্যোপদেশ। চরম পরীক্ষান্তে উপাধিদান।

নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি পাঠ্য পুস্তকরূপে গৃহীত হইল—

১। চরক-সংহিতা ২। সুশ্রুত-সংহিতা ৩। অষ্টাঙ্গ-সংগ্রহ ৪। অষ্টাঙ্গহৃদয় ৫। মাধব-নিদান ৬। হারীত সংহিতা ৭। সিদ্ধযোগ ৮। চক্রদত্ত ৯। ভাবপ্রকাশ ১০। শার্ঙ্গধর ১১। রসরত্ন-সমুচ্চয় ১২। রসেন্দ্রসার-সংগ্রহ ১৩। বঙ্গসেন ১৪। ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টু ১৫। রাজনিঘণ্টু ১৬। বনৌষধিদর্পণ ১৭। নাড়ীবিজ্ঞান ১৮। পরিভাষাপ্রদীপ ১৯। পথ্যাপথ্যবিনিশ্চয়।

শিশুর প্রবাহিকা (আমাশয়) ও রক্ত প্রবাহিকা চিকিৎসা।

(ঠাকুর মা জপে নিযুক্তা)

ঠা। নারায়ণ, নারায়ণ, দয়া কর দয়াল ঠাকুর আমার। জীবনের সাধ আমার পূর্ণ হয়েছে, এখন রাঙা পায়ে স্থান দাও।

(লীলার প্রবেশ)

লী। ঠাকুমা, কি করছ?

ঠা। জগন্নাথ, জগদীশ, জগদ্বল্লভ, সকলই নিয়েছ, আর প্রাণ টুকু কেন বাকী রাখ ঠাকুর।

লী। (উচ্চবাক্যে) ও ঠাকুমা, আমি এয়েছি।

ঠা। কে লীলা, আয়, দিদি আয়।

লী। ঠাকুরকে বলছিলে কি ঠাকুমা?

ঠা। এই বল্‌ছিলাম, সংসার থেকে কাছে ডেকে নিতে ভাই।

লী। কেন ঠাকুমা, তোমার কি কষ্ট হয়?

ঠা। কষ্ট কেন হবে দিদি। রোগ ত গাছের ফল নয় যে, পথে চল্‌তে চল্‌তে টুপ করে মাথায় প'ড়্‌বে। মানুষ নিজের পাপে রোগে ভোগে, আমি তেমন পাপও করিনি, রোগও শরীরে নেই। তারপর, সোণার চাঁদ তোমরা আমার বেঁচে থাক,—আমার কষ্ট কিসের?

লী। তবে যেতে চাইছ কেন ঠাকুমা?

ঠা। যমরাজা যে শমনের পর শমন দিচ্ছে ভাই। রাজার হুকুম অমান্য করা কি ভাল?

লী। শমন কি ঠাকুমা?

ঠা। প্রথম শমন, চুল পেকে শোণের নুড়ি হয়েছে, তারপর, বত্রিশ দাঁতের একটাও খুঁজে মেলে না, তারপর, চোখেও যেন একটু কম দেখি। কাণেও যেন খাট হয়েছি।

লী। যাই হ'ক দিদিমা, তুমি আছ,—যেন পাহাড়ের আড়ালে আছি। তুমি না থাকলে ছেলে পিলেগুলো কি বাঁচাতে পারতাম? তুমি না থাকলে যে ছেলে পিলে কি ক'রে বাঁচা'ব—সেই ভয়ে অস্থির হই।

ঠা। (হাসিয়া) আঃ পাগলী, বাঁচা'বার কর্ত্তা কি আমি!—সবই সেই ভগবানের হাত।

লী। সে তুমি যাই বল ঠাকুমা, দেখে-শুনে আমার বিশ্বাস হয়েছে,—চিকিৎসার দোষে. পরমায়ু থাকতেও রোগী মরে। ভগবান কর্ত্তা সেটা ঠিক, তবে মরা-বাঁচায় মানুষের হাতও কিছু আছে।

ঠা। তা এটা মিথ্যে বলিস্‌নি লীলা। সকল জিনিষের মত যত্ন করে রাখ'লেই শরীর বেশী দিন টেঁকে, আর অত্যাচার কর্‌লে শীঘ্র নষ্ট হয়।

লী। সেই জন্যেইত বল্‌ছি, তুমি যত দিন আছ,—পাহাড়ের আড়ালে আছি।

ঠা। তা, আমি আর কতদিন থাকব দিদি। আর তুমিও ত এখন পাকা-গিন্নি হয়ে দাঁড়িয়েছ। ঠাকুমার পুঁজিপাটা শেষ যা' আছে,—তা' শিখে নাও।

লী। আমার হয়েছে ঠেকে-শেখা আবার ঠেকিছি ব'লে শিখতে এয়েছি।

ঠা। কেন আবার কি ঠেকলি ?

লী। তা বেশ। ছোট খোকার রক্ত-মাশা, আর বড় খোকার শাদা আমাশা।

ঠা। তাইত—তোর ছেলে পিলের নিত্যি অসুখ দেখতে পাই। কেন এমন হয়, বল দেখি ?

লী। তা কি ক'রে বল্‌ব ঠাকুমা।

ঠা। তবে এতদিন আমার কাছে শিখলি কি ? সব কি ভস্মে ঘি ঢালা হ'ল। এই একটু আগে বল্‌লাম, যে, রোগ গাছের ফল নয়, নিজের দোষে রোগ হয়।

লী। তা কি জানি ঠাকুমা, আমিত কিছু বুঝতে পারি নে।

ঠা। আচ্ছা ওরা সকাল থেকে রাত পর্য্যন্ত যা খায়,—যা করে,— সব বল।

লী। সকালে উঠে প্রথমেই তোমার নাত্‌জামায়ের সঙ্গে চা, মাখন্‌, বিস্কুট আর কোন কোন দিন ডিম সিদ্ধ খায়। তারপর—

ঠা। থাম্‌। একে ত চা আমাদের দেশের উপযোগী নয়। তারপর, শীতকালে বেশী বয়সের মানুষে বরং খেতে পারে, কিন্তু ছেলেদের পক্ষে ওটা বড় অনিষ্টকর। চা খাওয়াটা, আগে বন্ধ কর।

লী। আচ্ছা তাই কর্‌ব।

ঠা। তারপর, মাখন ছেলেদের পক্ষে খুব উপকারী বটে, কিন্তু সে টাটকা মাখন। লোকনাথ বদ্দি বল্‌ত, যে, বাসি-মাখন বড্ড অপকারী। সেটা ঘি করে খাওয়াই ভাল।

লী। আচ্ছা, আমি বাসি কখন খেতে দেবো না। পারি ত রোজ টাটকা মাখন ক'রে দেবো, ঘরেত ১০।১২ সের দুধ হয়। কিন্তু একটা কথা ঠাকুমা, বাসি মাখনত সাহেব-সুবো আর বাবুরা খায়, তবে তাদের রোগ হয় না কেন ?

ঠা। রোগ হয় না,—তোমায় কে বল্লে ? কিন্তু আজ কুপথ্যি করলে কালইত রোগ হয় না। আগেকার লোকে যেমন বলবান আর দীর্ঘজীবি হ'ত, আজ-কালকার লোকে যে এত অল্পজীবী হয় আর রোগে ভোগে, অন্যান্য দোষের মধ্যে খাবার দোষ তার একটা প্রধান কারণ। যাক্‌ তারপর, তারা আর কি খায় বল।

লী। তারপর দুজনকেই একটু করে দুধ দিই।

ঠা। কত ক্ষণ পরে ?

লী। চা খাবার আধ ঘণ্টা পরে। বড় খোকা সেই সঙ্গে বাজারের দু' একখানা কচুরি সিঙ্গাড়া, কি জিলিপি খায়।

ঠা। না, তা' করোনা। ছেলেদের খাবার দেবার একটা নিয়ম ক'রো। বয়স বুঝে তিন চার ঘণ্টা অন্তর খেতে দিবে। তার চেয়ে শীঘ্র শীঘ্র খেলে অসুখ হয়। তারপর কি খায় বল।

লী। তারপর, বেলা নয়টার সময় দুজন-কেই পোরের ভাত দিই। ছোট খোকাকে দুধের সঙ্গে চট্‌কে, আর বড় খোকাকে মাছের ঝোল দিয়ে ঐ ভাত দেওয়ার ব্যবস্থা করি।

ঠা। তা' বেশ। কিন্তু তা'র আগে দু'জনকেই অন্য কিছু না দিয়ে সকালে একবার একটু ক'রে দুধই দিও, অন্য কিছু দিও না।

লী। কিন্তু তারা যে তাতে ভোলে না।

ঠা। না ভোলে একটু বেদানা, দুটো আঙ্গুর, দুটো খেজুর, দুখানা বাতাসা, কি এমনই কিছু তার সঙ্গে দিও।

লী। বাজারের খাবার কিছু দেব না?

ঠা। একেবারেই না। তোর ঠাকুর-দাদার এক বন্ধু—তাঁর বাড়ী ভাটপাড়ায়, তিনি বাজারের খাবার খাওয়াকে বজ্রাঘাত বলতেন। বাস্তবিকই তাই। জঘন্য ঘি-ময়দায় প্রস্তুত ধুলো-বালি-মিশান, বা হয়ত হালুই-কারের কোন ছোঁয়াচে রোগ আছে—তার হাতে প্রস্তুত। সে গুলো বিষ বৈকি। কাজেই তিনি যে বজ্রাঘাত বল্‌তেন, সেটা মিথ্যা নয়।

লী। কিন্তু ঠাক্‌মা, এই খাবার খেয়ে শত শত লোকও ত বেঁচে রয়েছে।

ঠা। আফিন-সেঁকোর মত বিষ খেয়েও ত কত লোকে বেঁচে থাকে ভাই। তা' ব'লে কি বুঝতে হবে, যে আফিন-সেঁকো আমাদের উপকারী!

লী। না, তা নয়।

ঠা। তাতো নয়ই। বেশীর ভাগ বুঝতে হবে যে, ঐ সব জিনিষ খায় ব'লে, তাদের পরমায়ু ক'মে যায় আর রোগ হয়। ভগবান্ মানুষের শরীরকে অতি আশ্চর্য্যভাবে নির্ম্মাণ ক'রেছেন ব'লে, তাদের সদ্যোমৃত্যু হয় না। যাক্ সে কথা, তার পর ওরা কি খায় বল।

লী। তার পর দশটার সময় তোমার নাতজামাই খেতে বসেন—দুজনেই তাঁর পাশে গিয়ে বসে। আর এটা-সেটা তরকারী, মাছ, মাংস—যেদিন যা হয়, একটু একটু খায়।

ঠা। খবরদার আর এমন কাজ না হয়। কচি-শিশু দুধ ছেড়ে সবে ভাত-তরকারী খেতে শিখেছে। তা'রা কি খুব মসলা দেওয়া নানা রকম তরকারী-মাছ-মাংস হজম করতে পারে? তাদের পেট এখনও ততটা পোক্ত হয় নি। সেই জন্যে বড় বড় মানুষে যা হজম ক'রতে পারে, তা ছেলেরা কখন পারে না এবং সেই জন্যে ও সকল জিনিষ তাদের দেওয়া উচিত নয়।

লী। আচ্ছা ঠাকমা আমি তাই করব। কিন্তু অভ্যাস হয়ে গেছে ব'লে ছেলেদের আটকে রাখা একটু দায় হবে।

ঠা। তা হোক লীলা। প্রাণ যাওয়ার চেয়ে, এমন আটকে রাখা ঢের ভাল। তার পর কি হয় বল।

লী। তার পর আমার শ্বশুর খেতে বসেন প্রায় ১১॥ টা ১২ টার সময়। সে সময়েও খোকারা তাঁর কাছে গিয়ে বসে আর তাঁর সঙ্গে কিছু কিছু খায়।

ঠা। উটিও বন্ধ ক'রে দিতে হবে লীলা। বড় মানুষ আর ছোট মানুষ—দুয়ের যেমন বয়স আলাদা, ভাবনা আলাদা, কার্য্য-ক্ষেত্র আলাদা, তেমনি তাদের খাবার ও আলাদা। আমরা ভালবাসায় ভুলে যদি বুড়োর বা যুবোর খাবার ছেলেকে দিই, সেটা ছেলের অপকার করা বই উপকার করা হয় না।

লী। তা' ঠাক মা, তুমি যা ব'লছ এখন আমি তাই করবো।

ঠা। তা হ'লে এখন বুঝতে পার্‌লি ত কেন তোর ছেলেদের রোগ হয়।

লী। হ্যাঁ বুঝেছি ঠাকমা,—রোগ কেবল খাওয়ানর দোষে, এখন থেকে সেটা আমি সব শুধরে নেব। বাজারের খাবার দেবোনা, ওঁদের সঙ্গে খেতে দেব না, চা খেতে দেব না, আর ৩।৪ ঘণ্টা অন্তর খাওয়াব। এখন এ দুটোর আমাশা আর রক্তামাশা কি করে ভাল হয় বল।

ঠা। তোর ছেলেদের পেটের অসুখের সময় যে সব বলেছিলাম, তা মনে আছে?

লী। খুব মনে আছে ঠাকুমা। তোমার

সেই পথ্যি আর টোটকা ওষুধে যে কত রোগী ভাল ক'রেছি তার ঠিক নেই।

ঠা। যাক্ সে কথা, এখন তোর ছেলে-দের অসুখের কথা বল্।

লী। ছোট খোকার আজ ৪।৫ দিন হল অসুখ ক'রেছে। প্রথমে সাদা আমাশয় হয়েছিল, ছুইদিন পরে রক্ত দেখা দিলে। প্রথম দু'দিন ২৫।৩০ বার ক'রে বাহ্যে হ'ত—মল আর আম মিশান। তা'রপর থেকে ১৫।১৬ বার ক'রে বাহ্যে করে—মল, আম আর রক্ত। কোন কোন বার শুধু আম আর রক্ত।

ঠা। বাহ্যে অনেক হ'য়ে গেছে ত?

লী। হাঁ বোধ হয় ২।৩ মালসা।

ঠা। শোন, ছোট খোকাকে ছানার জল, ছাগল দুধ, মুতোর সঙ্গে জল দিয়ে সিদ্ধ ক'রে তার সঙ্গে বার্লি রেঁধে দিবি।

লী। কি রকম করে সিদ্ধ করব?

ঠা। এক পোয়া ছাগল দুধ, এক পোয়া জল আর ৮।১০টা মুতো থেঁতো করে এক সঙ্গে সিদ্ধ করবি, জল ম'রে গেলে নামিয়ে ছেঁকে নিবি। তার পর তার সঙ্গে জল মিশিয়ে বার্লি সিদ্ধ করবি। রাঁধা শেষ হলে যেন তাতে দুধের সিকি আন্দাজ জল থাকে।

লী। সব কি একবারে খাওয়াব?

ঠা। না দু'বারে দিবি। দেখিস্ যেন খারাপ না হয়ে যায়।

লী। খারাপ হ'ল কিনা কি করে বুঝব?

ঠা। খারাপ হলে বদ্ রং হবে, বদ্ গন্ধ হবে। ছ্যাকড়া-ছ্যাকড়াও হতে পারে।

লী। দুধ কতটুকু দেব?

ঠা। সহজ বেলায় যা' খায়, তার অর্দ্ধেক দিবি। সঙ্গে সঙ্গে দেখ্‌বি যে দুধ, হজম হচ্ছে কি না। মল দেখে দুধ হজম হচ্ছে কিনা, কি করে বুঝতে হয় তা মনে আছেত?

লী। হাঁ মনে আছে। (পৌষ সংখ্যা ১৪৫ পৃষ্ঠা)

ঠা। দুধ হজম হচ্ছে না মনে হলে আরও কমাতে হবে।

লী। আর বাড়াব কখন?

ঠা যেমন অসুখ কমতে থাকবে, ছেলের ক্ষিদে বাড়বে—অমনি একটু একটু করে বাড়াবি।

লী। আর কি দেব?

ঠা। বার্লির বদলে শঠীর পালো, কি একটু এরারুটও দিতে পার। আর অন্য জিনিষের মধ্যে দাড়িমের রস, মিষ্টি কমলা-লেবুর রস, কচি বেলপাতার রস চিনি মিশা'য়ে, কাপড়ে ছেঁকে কাদার মত ক'রে দিতে পার।

লী। বেলের মোরব্বা দিতে পারি?

ঠা। ও না দেওয়াই ভাল। এক ত ওতে উপকার নেই, বেলের যেটা উপকারী, সেই ক্বাথটা সিদ্ধ ক'রে ফেলে দেয়। থাকে বেলের ছিবড়ে আর চিনি। তারপর বড় বড় বেলের মোরব্বা করে। কিন্তু বেলের কচিই উপকারী।

লী। তারপর, আর কি বল?

ঠা। রক্তামাশয়ে নাড়ীতে ঘা হয়। সেই জন্যে খাবার এমন দিতে হয়, যা'তে মল খুব কম জন্মায়। যে সব জিনিষ শক্ত, যা'তে ছিব্‌ড়ে আছে—এমন জিনিষ দিতে নাই, এটা খুব মনে রাখা চাই।

লী। তা' খুব রাখব। এখন ওষুদ কি দেব বল?

ঠা। দাঁড়া,—পথ্যির কথা আগে শেষ করি, তারপর ব'লব। সকল রোগেই

সুপথ্যির দরকার, কিন্তু রক্তামাশয়ে খুব বেশী। একটু কুপথ্যি হ'লেই রোগ তিল থেকে তাল হ'য়ে উঠে। তারপর ভাল হবার মুখে খুব সাবধান হওয়া চাই। একটু এদিক-ওদিক হ'লেই রোগ পাল্‌টে আসে।

দী। ভাল হবার মুখে কি রকম করবো?

ঠা। যত দিন রক্ত বন্ধ না হয়, তত দিন যা 'বলেছি তা ছাড়া আর কিছু নয়। রক্ত বন্ধ হওয়ার পরেও ৩।৪ দিন ঐ পথ্যি, তবে মাত্রাটা একটু বেশী দিবি এই মাত্র। এই সময়ে কিন্তু ছেলে সামলান দায় হবে, খুব ক্ষিদে হবে কিনা। কেবল খাই-খাই করবে, ভাত আর খাবারের জন্যে জুলুম করবে, সুবিধে পেলে চুরি ক'রে খাবে। কাজেই খুব চোখে-চোখে রাখবে, আর রোজই "কাল ভাত দেব" বলে ভুলিয়ে ৩।৪ দিন কাটিয়ে দিবি। এই সময় মল শক্ত হবে, হয়ত কোন কোন দিন দাস্ত বন্ধও যেতে পারে। তখন খুব পুরাণ মিহি চালের ভাত আর ছোট কৈ, মাগুর, শিঙ্গি মাছ ও কচি কাঁচকলার ঝোল দিবি। সমস্ত কাদার মত ক'রে চট্‌কে খাওয়াবি। ভাত একবারে বেশী নয়,—প্রথম দিন ১ তোলা চালের, তার পর দিন দেড় তোলা চালের,—এমনি করে বাড়াবি। রক্ত বন্ধ হ'বার পনর দিন পরে তবে পেট ভ'রে ভাত দিবি।

দী। তাই ক'রবো। এখন ওষুদ কি দেব বল?

ঠা। ছোট খোকার বয়স হল কত?

দী। এই মাসে যেটের চার বছরে পা দেবে।

ঠা। সকালে ১০।১২টা কচি দাড়িম পাতা বেশ ক'রে বেটে চেলুনী জল মধু মিশিয়ে কাপড়ে ছেঁকে খাইয়ে দিবি। আর দু'পরে ও বিকালে দু'বার কম-কম আধ ঝিনুক ক'রে মুতোর রস দিবি। চেলুনী জল কি মনে আছে ত?

দী। হাঁ আছে। (পৌষ সংখ্যা)

ঠা। দু'দিন ওষুদ দিয়ে যদি রক্ত ও বাহ্যে কমে, তবে আর কিছু দিতে হবে না, ওতেই সেরে যাবে। আর দু'দিনে যদি উপকার না হয়, তা 'হলে সকালে দাড়িম পাতা বাটা, দু'পরে মুতোর রস এক বার, বিকালে দুই আনা বটের ঝুরি বাটা চেলুনী জলের সঙ্গে, আর সন্ধ্যায় কৃষ্ণ জীরা ও ধুনোর খুব মিহি গুঁড়ো সমান ভাগে মিশিয়ে দুই রতি ৩০।৪০ ফোটা বেল পাতার রসের সঙ্গে খাইয়ে দিবি। এতেই ভাল হ'য়ে যাবে।

দী। এতে যদি ভাল না হয়?

ঠা। এতেই ভাল হ'য়ে যা'বে, ভয় নেই। তবে শিখে রাখ, যে, রক্তামাশয়, বিশেষ পুরাণ রক্তামাশয়ে কুড়্‌চির মত ওষুদ আর নাই। টাটকা কুড়্‌চি ছালের কাথ সিদ্ধ ক'রে যখন ক্ষীরের মত ঘন হবে, তখন আগুণ থেকে নামিয়ে সেই ঘন কাথের সিকি আন্দাজ নিয়ে তা'তে আতইচের গুঁড়ো বেশ করে মেশাবে। সেই ওষুদ এক রতি কি দু'রতি চেলুনী জলে গুলে খাওয়াতে হয়। এ ওষুদটী রক্তামাশয়ে ধন্বন্তরি।

দী। আতইচ কি ঠাকমা?

ঠা। বেণের দোকানে কিন্‌তে পাওয়া যায়,—ময়লা রঙ্গের মাঝারি শিকড়ের মত লম্বা লম্বা; ভাঙ্গলে ভেতর বেশ সাদা।

দী। ওষুদ কি রোজ ত'য়ের ক'রতে হয়?

ঠা। না, একদিন কর্‌লে ১৪।১৫ দিন, কি এক মাস দেড় মাসও ভাল থাকে।

লী। বড় লোকের কি মাত্রায় দিতে হয়?

ঠা। এক আনা থেকে দু'আনা মাত্রায় দেওয়া চলে।

লী। আচ্ছা এখন বড় খোকার কি ক'রব বল?

ঠা। অসুখের খবর সব বল?

লী। তা'র আজ তিন দিন হল সাদা আমাশা হয়েছে। ১৫।২০ বার বাহ্যে যায়। একটু-একটু বাহ্যে যায়, আর তা'র সঙ্গে থোলো-থোলো আম। বাহ্যের সময় খুব কোঁতায়, আর পেটের কামড়ানিও খুব।

ঠা। এ তিন দিনে কি খুব বেশী বাহ্যে হয়েছে?

লী। না বাহ্যে বেশী কৈ হয়েছে? অনেক বার বাহ্যে যায়, আর খুব কোঁতায় বটে কিন্তু বাহ্যে খুব কম হয়। ছেলেটা তিন দিনে খুব কাবু হয়ে পড়েছে। যা'তে শীঘ্র ভাল হয়, তাই কর ঠাক্‌মা।

ঠা। শোন বলি, প্রথমে একটা জোলাপ দিয়ো।

লী। সে কি ঠাকমা, এই ১৫।২০ বার বাহ্যে, তার ওপর আবার জোলাপ।

ঠা। হাঁ তাই। এ রকম অবস্থায় জোলাপ দিলে রোগী যন্ত্রণা পেয়ে পঞ্চাশ বারে যে বাহ্যে ক'রত, সেটা ২।৩ বারে বেরিয়ে যায়, রোগীর যন্ত্রণা কমে, আর রোগও শীঘ্র ভাল হয়ে যায়।

লী। সব আমাশয়ে কি জোলাপ দিতে হয়?

ঠা। না তা কেন? যেখানে আপনা হতে খুব বাহ্যে হয়, সেখানে জোলাপ দিতে নেই। কিন্তু যেখানে একটু-একটু মল যন্ত্রণার সঙ্গে বারংবার বেরোয়, সেখানে জোলাপ দেওয়া খুব দরকার।

লী। তা'—কি জোলাপ দেব বল?

ঠা। বড় খোকার বয়স কত হল?

লী। এই ষেটের সাত বছরে প'ড়েছে।

ঠা। তা 'হলে এক কাজ ক'র, হত্তুকী এক সিকি আর পিপুল আধ আনা বেটে ছটাক খানেক গরম জলের সঙ্গে খাইয়ে দিও।

লী। তারপর কি করব?

ঠা। ৪।৫ বার বাহ্যে হ'য়ে অনেকটা মল আর আম বেরিয়ে গেলে, ছেলে একটু স্বস্তি পাবে, যন্ত্রণা অনেক কম হ'য়ে যাবে। সে দিন আর কোন ওষুদ দিস্‌নে। তার পর দিন থেকে সকালে কাঁচা বেল পোড়া আধ তোলা, আকের গুড় এক সিকি, পিপুলের গুঁড়ো ২ রতি, আর শুঠের গুঁড়ো ২ রতি এক সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়াবি। এক পোয়া ছাগল দুধ, তিন পোয়া জল আর ৮।১০ টা থেঁতো করা মুতো এক সঙ্গে সিদ্ধ ক'রে জল মরে গেলে নামা'বি। সেই দুধ এক এক ছটাক ক'রে দু'রতি মরিচের গুঁড়ো মিশিয়ে দু'বার দিবি। আর বিকালে একবার কচি বেল পোড়া আধ তোলা, খোসাহীন কৃষ্ণ তিল বাটা এক সিকি আর দৈয়ের সর এক সিকি, এক সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়াবি। এতেই ভগবানের ইচ্ছায় সেরে যাবে।

লী। আর দুই একটা ওষুদ বল না ঠাকমা?

ঠা। (১) খোসাহীন কৃষ্ণ তিল বাটা দুই আনা, যষ্টিমধুর গুঁড়ো এক আনা, চিনি দু'আনা, মধু ১৫।১৬ ফোঁটা আর তিলের তেল ৩।৪ ফোঁটা এক সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়ালে আমাশা নষ্ট হয়। বাহ্যের সঙ্গে রক্ত থাক-

লেও বন্ধ হ'য়ে যায়। (২) থৈয়ের গুঁড়ো এক আনা, যষ্টিমধুর গুঁড়ো এক আনা, চিনি এক আনা, মধু ১৫।১৬ ফোঁটা—এক সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়ালে আমাশা ভাল হয়। মুতো, পিপুল, আতইচ আর কাঁকড়াশৃঙ্গী সমান ভাগে গুঁড়ো ক'রে ৩ রতি মাত্রায় মধুর সঙ্গে খাওয়ালে আমাশা ভাল হয়। সামান্য জ্বর, কি সর্দ্দি-কাশি থাকলে,—তাও যায়।

লী। কাঁকড়াশৃঙ্গী আবার কি?

ঠা। কাঁকড়ার দাড়ার মত এক রকম ফল; বেণের দোকানে পাওয়া যায়। যে গুলো বেশ লাল থাকে সেই গুলোই ভাল।

লী। সবাইকে কি এক মাত্রায় দিতে হয়?

ঠা। এত দিন শিখে বুঝি এই বিদ্যে হল? আমি সাত বছরের ছেলের পক্ষে যা' মাত্রা, তাই বলেছি। বয়স বুঝে কম-বেশী ক'রে নিতে হয়।

লী। ক'বার ক'রে ওষুদ দেওয়া ভাল?

ঠা। দু'বার, জোর তিনবার। তবে বেলপোড়াটা আহার-ওষুদ দুই। বেলপোড়া ওষুদ ছাড়াও ২।১ বার দেওয়া যেতে পারে। বেলশুঁঠ জলে সিদ্ধ ক'রে নিয়ে, সেই জল দিয়ে বার্লি পাক ক'রে দিলেও চলে।

লী। তারপর পথ্যি কি দেব বল?

ঠা। ছোট খোকাকে যা-যা দিতে ব'লেছি, তাই দিবি। তা'ছাড়া একটু টাট্‌কা ঘোল কাপড়ে ছেঁকে দিতে পারিস, কিন্তু এটী যদি জ্বর ভাব না থাকে, তবেই দিস্। হাঁ ভাল কথা, ছোট খোকার বেলাও যেমন কাপড়ে ছেঁকে নিতে বলেছি এর বেলাও সেই রকম করবি,—ওষুদ পথ্যি সব। যেন শক্ত কি করকরে কোন জিনিষ পেটে না যায়।

লী। কেন ঠাকুমা এতে ত নাড়ীতে ঘা হয় না।

ঠা। ঘা না হোক, নাড়ী ফোলে, ব্যথা হয়। কাজেই মল যত কম হয় আর মলের সঙ্গে শক্ত ভাবটা না থাকে, সেটা দরকার। ব্যথার উপর সামান্য কিছু লাগ্‌লে কষ্ট হয় আর ব্যথা বেড়ে যায়, তা জানত। তা' এ মনে কর নাড়ীর ভিতর কত নরম জায়গা।

লী। আচ্ছা তাই ক'রবো কিন্তু আর কিছু খেত দেব না?

ঠা। ছোট খোকার মত একে অত ধরা-কাটায় রাখতে হবে না। আম পাক পেলে একটু মসূর দালের যূষ আর মাছের ঝোল কাপড়ে ছেঁকে দিস। কাঁচকলা আর মাছ, ঝোলে চ'ট্‌কে তার পর ছেঁকে দিবি।

লী। তা, আম পাক পাওয়া বুঝবো কি ক'রে?

ঠা। আম বেশী থাকলে মলে দুর্গন্ধ হয়, পেটে গুড় গুড় শব্দ হয়, পেটের শূলুনী হয়, অল্প অল্প মল নির্গত হয়। আর যত আম পাক পায়, তত ঐ সকল উপসর্গ ক'মে আসে। আম পাক পেলে মলে দুর্গন্ধ থাকে না, পেটে গুড় গুড় শব্দ থাকে না, শূলুনী কম হয় আর দাস্ত সহজে হয়।

লী। একেও কি ভাল হবার মুখে ছোট খোকার মত ধরা-কাটায় রাখতে হবে।

ঠা। তত্টা না হোক, দিন কতক বেশ ধরা-কাটায় রাখতে হ'বে বৈকি। একেবারে খুব পেট ভ'রে খেতে দেবে না। দিন কতক যে সব পথ্যি বলেছি, তা ছাড়া আর কছু দেবে না।

(প্রফুল্লের প্রবেশ)

লী। তুমি আবার এসে হাজির কেন

ঠা। (হাসিয়া) আজ কালকার বাবুরা যে বেজায় মাগমুখো। এতক্ষণ ছিল—সেই বাহাদুরী।

প্র। ঠাকুমা, সত্যি বলছি, আগে মাগ-মুখোই ছিলাম বটে, কিন্তু এখন লীলা যেমন কাজ করে, আমিও তেমনি কাজ করি। হয় না-হয় জিজ্ঞাসা কর।

লী। সত্যি ঠাকমা, এখন সংসারের সকলে কিসে সুখে থাকে তার জন্য চেষ্টা দেখতে পাই। পাড়া-প্রতিবাসী গরীবদুঃখীর উপকারও করেন শুনতে পাই।

ঠা। বেশ, বেশ, শুনে বড় সুখী হলাম। এতেইত মানুষের মনুষ্যত্ব।

প্র। তবেই বোঝ ঠাকমা, এখানে মাগ-মুখো হ'য়ে আসিনি। তবে মাগের ঠাকুমা-মুখো হয়ে এসেছি।

ঠা। হঠাৎ ঠাকুমার উপর বাবুর এত সুনজর পড়লো কেন বল দেখি।

প্র। সেটা সত্যি বলতে কি, ঠাকমা, তোমার জন্যেও নয়, আমার জন্যেও নয়—বড় ছেলেটার জন্যে।

ঠা কেন তার ব্যবস্থাত করে দিলাম।

প্র। সে পেটের কামড়ানিতে এত অস্থির হ'য়েছে যে, সে ব'লে বুঝাবার নয়। আমি ছুটে ডাক্তারের কাছে গেলাম, ডাক্তার বল্লে—হয়—মর্ফিয়া মিক্‌শ্চার দিয়ে ঘুম পাড়াবে, নয়—মর্ফিয়ার পিচকারী দেবে। তা তোমায় জিজ্ঞাসা না ক'রে কিছু ক'ল্লে লীলা ভারী রাগ করবে। তাই ছুটে তোমার মত জানতে এসেছি। ছেলেটার কষ্ট আর চক্ষে দেখা যায় না।

লী। তুমি কি বল ঠাকুমা?

ঠা। আহা বাছারে, বড় কষ্ট পাচ্ছে। তা' ও ঘুম পাড়ান, কি পিচকরিয়ে দরকার নাই। এই প্রলেপটা দিলে যন্ত্রণা ক'মে যাবে এখন,—থুলকুড়ি পাতা, যোয়ান, আদা আর মৌরী, সমান ভাগে বেটে নাভির চারিদিকে প্রলেপ দিবি। তার পর একখানা লোহার হাতা গরম ক'রে—সয়—এমন ভাবে প্রলেপের ওপর চেপে ধরবি। যখন যন্ত্রণা বেশী হবে, তখন এই রকম ক'রলেই যন্ত্রণা ক'মে যাবে।

লী। তা থুলকুড়ি পাতা এখন কোথায় পাব?

ঠা। বাজারে পাওয়া যায়, বেদেদের কাছে পাওয়া যায়, পাচন ওয়ালার কাছে পাওয়া যায়। অনেক কবিরাজের বাড়ীতেও থাকে। আজ নেহাৎ কাঁচা না পাওয়া গেলে টাটকা শুকনো নিলেও চলবে। কাল থেকে কাঁচা যোগাড় করে নিও।

প্র। দেখ লীলা, আমি তবে মসলাগুলো নিয়ে যাচ্ছি, তুমি আর দেরী ক'রো না।

(প্রফুল্লের প্রস্থান)

লী। আমি তবে আসি ঠাকমা। ছেলে-টার কষ্টের কথা শুনে মনটা বড় খারাপ হ'ল।

ঠা।* আহা তা 'হবে না, মার প্রাণ। তা, এস দিদি। আমারও বড় ভাবনা রইল। দু'বেলা খবর দিতে ভুলো না।

লী। সে তোমায় ব'লতে হবে না, এখন আসি।

(লীলার প্রস্থান)

ঠা। ধন্য মহামায়ার মায়া! মায়া-রজ্জুতে বদ্ধ ক'রে ক্ষণবিনশ্বর বস্তুতে আপনার ব'লে ভ্রম জন্মিয়ে কি খেলা খেলাচ্ছ মা মরণের পথে এক পা দিয়েছি, আজ বাদে কাল সকল আপনার-জনকে ছেড়ে যেতে হ'বে, এখন একটা নাতনীর ছেলের রোগ-যন্ত্রণার কথা শুনে মনটা কাতর হয়ে উঠলো। মা! মা মায়ার বাঁধন কেটে দে মা! এ অন্তিম সময়ে ঐ রাঙা চরণ দুখানি ছাড়া প্রাণে আর যেন কোন ভাবনা না আসে

কুষ্ঠ ও বাতরক্তের ভেদ-নির্ণয়।

—০:*:০—

(আয়ুর্ব্বেদ সভায় পঠিত।)

চিকিৎসকগণের নিকট রোগ সমূহ নানা মূর্ত্তিতে সুপরিচিত। কতকগুলি মারাত্মক, কতকগুলি দারুণ-যন্ত্রণাদায়ক, কতকগুলি পৈতৃক, কতকগুলি স্বোপার্জ্জিত; আবার কতকগুলি একাধারে সর্ব্বগুণ সম্পন্ন। এই শেষোক্ত ব্যাধি সমূহের মধ্যে কুষ্ঠ রোগকে সর্ব্বপ্রধান বলিলে, বোধ হয় কোন দোষ হয় না। নাম মাত্রে ভীতি-উৎপাদক, বন্ধু-আত্মীয়-স্বজনাদির সম্বন্ধচ্ছেদক, সাক্ষাৎ জীবন্মৃত্যু-নিষ্পাদক,—এমন রোগ অতি অল্পই আছে। তাই কুষ্ঠ-চিকিৎসা-প্রশংসায় উক্ত হইয়াছে,—

"কন্যাকোটিপ্রদানেন গঙ্গায়াং পিতৃতর্পণে।
বিশ্বেশ্বরপুরীবাসে তৎফলং কুষ্ঠনাশনে।
গবাং কোটিপ্রদানেন চাশ্বমেধশতেনচ।
বৃষোৎসর্গেচ যৎ পুণ্যং তৎপুণ্যং কুষ্ঠনাশনে॥"

[রসেন্দ্র,—কুষ্ঠ চিকিৎসা]

কোটি কন্যাসম্প্রদান ও গঙ্গাতে পিতৃ পুরুষগণের তর্পণ এবং কাশীধামে বাস করিলে যে ফল,—গো-কোটিদান, শত অশ্বমেধ যজ্ঞ এবং বৃষোৎসর্গ করিলে যেরূপ পুণ্য সঞ্চয় হয়,—কুষ্ঠরোগ আরোগ্য করিলে, সেইরূপ পুণ্য ও সেই ফল হইয়া থাকে। এমন উক্ত প্রশংসা আর কোন রোগ-চিকিৎসাতেই দেখা যায় না। প্রশংসাও অন্যায্য নহে।

চিকিৎসা করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে রোগ নির্ণয় আবশ্যক। মহর্ষি আত্রেয়ের এই মহতী উক্তি কেবল আয়ুর্ব্বেদের নহে, সর্ব্বদেশীয় চিকিৎসা-শাস্ত্রেরই মেরুদণ্ড স্বরূপ।

রোগমাদৌ পরীক্ষেত ততোঽনন্তরমৌষধম্।
ততঃ কর্ম্ম ভিষক্ পশ্চাদ্ জ্ঞান পূর্ব্বং সমাচরেৎ।
যস্তু রোগমবজ্ঞায় কর্ম্মাণ্যারভতে ভিষক্।
অপ্যৌষধ বিধানজ্ঞ স্তস্য সিদ্ধির্যদৃচ্ছয়া॥

(চরকসূত্র—মহারোগাধ্যায়।)

অর্থাৎ চিকিৎসক সর্ব্বাগ্রে রোগ-পরীক্ষা বা রোগ-নির্ণয় করিবেন। তাহার পর ঔষধ নির্ব্বাচন করিবেন। তাহার পর জ্ঞান পূর্ব্বক অর্থাৎ যুক্তিযুক্ত চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইবেন। যিনি রোগ-নির্ণয় না করিয়া, চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হন, ঔষধ-প্রয়োগ-বেত্তা হইলেও সেই চিকিৎসকের সিদ্ধিলাভ অর্থাৎ রোগ-আরোগ্য সম্পাদন কদাচিৎ বা দৈবক্রমেই ঘটিয়া থাকে।

রোগ নির্ণয় দ্বিবিধ। (১) রোগের স্বরূপ নির্ণয় (২) তৎসদৃশ বা তৎসজাতীয় অন্য রোগ-সমূহ হইতে পার্থক্য নির্ব্বাচন। দার্শনিকের ভাষায় বলিতে হইলে রোগের লক্ষণ দ্বিবিধ * (১) স্বরূপ প্রতিপাদক (২) ইতরব্যবর্ত্তক। আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থে রোগসমূহের যে লক্ষণাবলী বর্ণিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে যুগপৎ এই দ্বিবিধ লক্ষণ সন্নিবিষ্ট। ভেদক বা ইতর-ব্যবর্ত্তক লক্ষণ স্বতন্ত্রভাবে প্রায়ই উপদিষ্ট হয় নাই। কিন্তু ব্যাধিসমূহের পরস্পরের সহিত সংশয় উপস্থিত হইলে, ভেদক লক্ষণের সাহায্য

* অব্যাপ্তি ও অতি ব্যাপ্তি লক্ষণের এই দ্বিবিধ দোষ। তাহা নিবারণের জন্যই দ্বিবিধ লক্ষণ নির্দ্দেশ করা আবশ্যক।

ব্যতীত রোগনির্ণয় সম্ভব নহে। সেইগুলি বিশ্লেষণ পূর্ব্বক উপদেশ করা টীকাকারগণের কর্ত্তব্য। বিজয় রক্ষিত, শ্রীকণ্ঠ, ভাবপ্রকাশকার ভাবমিশ্র প্রভৃতি,* অতিসার ও গ্রহণী, মূর্চ্ছা ও অপস্মার, মূত্রাঘাত ও মূত্রকৃচ্ছ ইত্যাদি অনেক রোগেরই ভেদক লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু কতকগুলি রোগ সম্বন্ধে তাঁহারা সম্পূর্ণ নীরব রহিয়া গিয়াছেন। সেইগুলির মধ্যে কুষ্ঠ ও বাতরক্তের নাম করা যাইতে পারে, এবং সেই সম্বন্ধে আলোচনা করাই অদ্যকার এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

সংশয় ভঞ্জনের পূর্ব্বে, সংশয় আছে কিনা, তাহার মীমাংসা প্রয়োজন। ভেদ-নির্ণয়ের পূর্ব্বে কুষ্ঠ ও বাতরক্তের মধ্যে কিরূপ সাদৃশ্য আছে তাহা দেখা কর্ত্তব্য। এই জন্য আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থাবলী হইতে বচন সমূহ উদ্ধৃত করা আবশ্যক। কিন্তু এই সমস্ত অংশই চিকিৎসক মাত্রেরই সুপরিজ্ঞাত বলিয়া অতি সংক্ষেপে একান্ত প্রয়োজনীয় স্থল মাত্র উদ্ধৃত করিতেছি।

কুষ্ঠের পূর্ব্বরূপ—

স্পর্শাজ্ঞত্বমতিস্বেদো ন বা বৈবর্ণ্যমুন্নতিঃ।
কোঠানাং লোমহর্ষশ্চ কণ্ডূস্তোদঃ ...
ব্রণানামধিকং শূলম্ ......
সুপ্তাঙ্গতা চেতি কুষ্ঠ লক্ষণমগ্রজম্।

অর্থাৎ স্পর্শজ্ঞানের অন্যথাভাব, অতি স্বেদ, স্বেদাভাব, বিবর্ণতা, কোঠ সমূহের (মণ্ডল বিশেষ) উৎপত্তি, রোমাঞ্চ, কণ্ডূ, সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা, ক্ষত সমূহে অত্যন্ত যন্ত্রণা, অঙ্গের সুপ্ততা অর্থাৎ স্পর্শজ্ঞানাভাব ইত্যাদি কুষ্ঠের পূর্ব্বরূপ।

[চরক চিকিৎসা স্থান, কুষ্ঠ চিঃ অঃ]।

অঙ্গপ্রদেশানাং স্বাপ অসৃজঃ কৃষ্ণতা চ... যত্র যত্র দোষো বিক্ষিপ্তো নিঃসরতি তত্র তত্র মণ্ডলানি প্রাদুর্ভবন্তি।

[সুশ্রুত নিদাঃ স্থাঃ—কুষ্ঠ নিদান]

অর্থাৎ দেহের স্থান সমূহে সুপ্তি,* রক্তের কৃষ্ণবর্ণতা .. যে সমস্ত স্থানে দোষ বিস্তৃত হইয়া বহির্ম্মুখ হয় সেই সমস্ত স্থানে মণ্ডল সমূহ উদ্গত হইয়া থাকে।

এস্থলে বক্তব্য অষ্টাঙ্গহৃদয়কার বাগ্‌ভট্ট কুষ্ঠপূর্ব্বরূপে চরক ও সুশ্রুতোক্ত লক্ষণগুলি একত্র সংগ্রহ করিয়াছেন। মাধবকর বাগভটের বচনগুলি অবিকল উদ্ধৃত করিয়াছেন।

বাতরক্তের পূর্ব্বরূপ—

স্বেদোঽত্যর্থং নবা কার্ষ্ণ্যং স্পর্শাজ্ঞত্বং
ক্ষতেঽতিরুক্
নিস্তোদঃ...কণ্ডূঃ ..
বৈবর্ণ্যং মণ্ডোলোৎপত্তির্বাতাসৃক্-পূর্ব্বলক্ষণম্।

[চরক-বাং শোং চিকিৎসিতাধ্যায়]।

অর্থাৎ অত্যন্ত স্বেদ, স্বেদাভাব, কৃষ্ণবর্ণতা, স্পর্শজ্ঞানাভাব, ক্ষতে অত্যন্ত যন্ত্রণা, জানু, জঙ্ঘা, উরু, কটী, স্কন্ধ ও শরীরের সন্ধি সমূহে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা, চুলকানি...বিবর্ণতা, মণ্ডলোৎপত্তি—এইগুলি বাতরক্তরোগের পূর্ব্বরূপ। বাগভট পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছেন, বাতরক্তের পূর্ব্বরূপ—কুষ্ঠপূর্ব্বরূপের সদৃশ।

"তস্য লক্ষণং ভবিষ্যতঃ কুষ্ঠসমম্"

কুষ্ঠের রূপ—

রৌক্ষ্যং শোষস্তোদঃ শূলং সঙ্কোচনং তথায়াসঃ।
পারুষ্যং খরভাবো হর্ষঃ শ্যাবারুণত্বঞ্চ—
কুষ্ঠেষু বাতলিঙ্গম্—

অর্থাৎ রুক্ষতা, শুষ্কতা, সূচীবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা, শূল, সঙ্কোচ, শ্রমবোধ অর্থাৎ অবসাদ, পরুষতা কর্কশতা, রোমাঞ্চ, শুক্লানুবিদ্ধকৃষ্ণবর্ণত্ব ও রক্তবর্ণত্ব, এইগুলি কুষ্ঠের বাতকৃত লক্ষণ।

—দাহো রাগঃ পরিস্রবঃ পাকঃ। বিস্রগন্ধঃ
ক্লেদ স্তথাঙ্গপতনঞ্চ পিত্তকৃতম্ * * * *

অর্থাৎ দাহ, রক্তবর্ণতা, অত্যন্ত স্রাব, পক্বতা, পূতিগন্ধ, ক্লেদ ও অঙ্গপতন,—এইগুলি কুষ্ঠের পিত্তকৃত লক্ষণ।

শ্বৈত্যং শৈত্যং কণ্ডূঃ স্থৈর্য্যং
সোৎসোধগৌরবস্নেহাঃ।
কুষ্ঠেষু তু কফলিঙ্গম্—

অর্থাৎ শুক্লবর্ণতা, শীতবোধ, চুলকানি, কাঠিন্য, উচ্চতা (শোথের) গুরুত্ব ও স্নিগ্ধতা কুষ্ঠের কফকৃত লক্ষণ।

[চরক—কুষ্ঠ চিকিৎসা অধ্যায়]

বাতরক্তের রূপ –

বিশেষতঃ শিরায়ামতোদস্ফুরণ ভেদনম্।
শোথস্য কার্ষ্ণ্য-রুক্ষত্ব-শ্যাবতা-বৃদ্ধিহানয়ঃ ··
অনিলোত্তরে—

অর্থাৎ, বিশেষতঃ শিরাসমূহের আকর্ষণ (টান ধরা), সূচীবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা, স্পন্দন, বিদীর্ণবৎ বেদনা, শোথের কৃষ্ণতা, রুক্ষতা, শ্বেতকৃষ্ণবর্ণতা, বৃদ্ধি ও হ্রাস ইত্যাদি বাতরক্তে বাতাধিক্যের লক্ষণ।

বিদাহো বেদনা মূর্চ্ছা স্বেদ স্তৃষ্ণা মদোভ্রমঃ।
রাগঃ পাকশ্চ ভেদশ্চ শোষশ্চোক্তানি
পৈত্তিকে॥"

বিশিষ্টরূপ দাহ, বেদনা, মূর্চ্ছা, স্বেদ, তৃষ্ণা, মত্ততা, ভ্রম, লৌহিত্য, পক্বৎ ভাব, বিদারণবৎ যন্ত্রণা,—এইগুলি বাতরক্তে পিত্তাধিক্যের লক্ষণ।

স্তৈমিত্যং গৌরবং স্নেহঃ সুপ্তির্মন্দা চ রুক্ কফে।

আর্দ্রতাবোধ, গুরুত্ব, স্নিগ্ধতা, সুপ্তি ও বেদনার অল্পতা—এইগুলি বাতরক্তের কফাধিক্যের লক্ষণ।

[চরক-চিঃস্থাঃ বাং শোঃ চিঃ অঃ]।

কুষ্ঠবহুত্তানং ভূত্বা কালান্তরেণ অবগাঢ়ী ভবতি। অর্থাৎ বাতরক্ত প্রথমে কুষ্ঠের মত ত্বক্ ও মাংস আশ্রয় করে, পরে, কালক্রমে গভীর ধাতুগত হয়।

[সুশ্রুত চিঃ স্থাঃ মহাবাতব্যা চিঃ অঃ]

এস্থলে একটু বক্তব্য আছে। চরকে কুষ্ঠ চিকিৎসিতাধ্যায়ে যে গুলি কুষ্ঠের দোষভেদে লক্ষণ বলা হইয়াছে, নিদানস্থানে কুষ্ঠ নিদানে প্রায় সেইগুলিকেই সপ্তাত ক্রিমি-কুষ্ঠের দোষকৃত উপদ্রব রূপে বর্ণিত হইয়াছে। সুশ্রুতের কুষ্ঠ-নিদানে সামান্যতঃ দোষজলিঙ্গ বলিয়াই এই গুলির নির্দ্দেশ আছে। চরকের চিকিৎসিত স্থানে স্বেদের উল্লেখ নাই, নিদান-স্থানে উল্লেখ আছে। সুশ্রুতের নিদান স্থানে, বাতজন্য বলিয়া স্বেদের পাঠ আছে। এই সম্বন্ধে যথা স্থানে বিচার করিব।

কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, কুষ্ঠ সপ্ত-ধাতুগত ও ত্রিদোষাত্মক, বাতরক্ত প্রধানতঃ বাত ও রক্তদুষ্টিসম্ভূত। উভয়ের কারণ সমূহেরও পার্থক্য আছে। সুতরাং ভেদ-নির্ণয় দুরূহ নহে। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে রোগ পরীক্ষার কালে এই সংপ্রাপ্তি ও কারণের পার্থক্য নিরূপণ অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। নিদান ও সংপ্রাপ্তি প্রায়ই পরোক্ষ। প্রত্যক্ষ পূর্ব্বরূপ, রূপ, উপশয় অনুপশয় এই তিনটাই আমাদের রোগ-নির্ণয়ের প্রধান সম্বল। তন্মধ্যে গূঢ় লিঙ্গং ব্যাধিম্ উপশয়ানুপশাভ্যাং পরীক্ষেত" অর্থাৎ চিকিৎসার ফলাফলের দ্বারা রোগ নিরূপণ,—অন্ততঃ কুষ্ঠ ও বাতরক্ত সম্বন্ধে সুসাধ্য নহে। কারণ অধিকার ও ঔষধাবলী স্বতন্ত্ররূপে উপদিষ্ট হইলেও, প্রকৃত পক্ষে আমরা অন্ততঃ সাধারণতঃ চিকিৎসার কোন পার্থক্য করি না। ঔষধ সমূহের ফল-